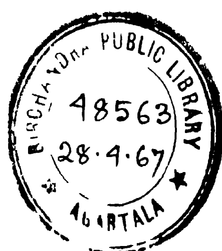
জল দাও ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ





আনন্দ পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলকাতা ৯



প্রকাশক :
শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৫৭

মূল্য : ৩.৫০

উৎসর্গ

(ভেবে-টেবে

শেষ পর্যন্ত)

নিজেকেই ।

ভূমিকা

ঠিক আগের পৃষ্ঠাটি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বলবেন—তওবা। উৎসর্গ, নিজেকেই ? কতকটা থুথু গেলার মত হল না।

হোক, লেখক নাচার। বোকামির ভাগী হতে কাউকে ডাকার মানে হয় না।

মানে হয় না তার আর লেখারও। অনাস্থা প্রস্তাব পাস হবার পরও গদি কামড়ে থাকার কসরতের নাম তো ছারপোকামি ?

ও-প্রস্তাবটা বহুদিন আগেই নিঃশব্দে পাস হয়ে গেছে। পাস করেছেন বঙ্গীয় পাঠক-সম্পাদক-সমালোচক-আর-প্রকাশককুল। দফতরির বাড়ি তার বইয়ের ফরমা নিয়ে উই আর ইঁদুরের ব্যবহার দেখে দেখে তার ঘেন্না ধরেছে। গালগল্প বানাতে চিতে আর সাধ যায় না। কতবার সে কসম খেল যে, কলম আর বাগিয়ে বসবে না। না-ছোড় গিন্নী আর ইয়ারদের কাছে দোহাই পাড়ল—কাজের চাপ।

ওটা, বস্তুত, ছুতো। আসলে তার দৃঢ় প্রতীতি—অথবা ভীতি—হয় সে লিখতে জানে না, নয় লোকে জানে না পড়তে। যেহেতু দ্বিতীয়েরাই দলে ভারী, আর সবাই মিলে ভুল করছে এ কখনও হতে পারে না!, অতএব সে একাই ভোটে বাতিল হোক। যে পালায় সেই বাঁচে, এই নীতিই শ্রেয়। লাখ কথার এক কথা—"মা লিখ।"

"একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হয় দুই জনে।" দুইজন কেন, দুই যুগ জুড়ে এই পেচকটির আধজনও জোটেনি। খাসা তার চেঁচানি সে নিজেই এবার থামাক।

একেবারেই কিছু মেলেনি ? সেটা বললে বে-ইমানি হবে। সম্পাদকীয় দয়া-সাগরের নেকনজর কখনও কখনও ঝিনুকে উঠে এসেছে। কোন্ গলিতে কবে ব্যাট পিটিয়ে কিছু রান তুলেছিল, সেই সুবাদে শারদায় টেস্ট টিম্-এও জায়গা মিলেছে, কিন্তু দোষ তারই—সুবিধা করতে পারেনি।

অগ্রজ লেখকদের স্বীকৃতি সে বিশেষ পায়নি, ব্যতিক্রম প্রথম আমলে তারাশঙ্কর, আর একালে মনোজ বসু। দু'চারটে বই উপহার দিয়ে দেখেছে,

অনেকে পাতা উলটেও দেখেন না। সমবয়সীদের পিঠ সে প্রায়ই চুলকে দিতে গিয়েছে আর এদিকে তার নিজের পিঠ ঘামাচিতে ঘা হয়ে গেছে। অনুজদের উপেক্ষা তো শীতলতর, অঙ্কের মাস্টারমশায়কে দেখলে ছাত্রদের যেমন পাশ কাটানো ভব্যতা। প্রকাশকেরা তার বই ছাপেন বটে, কিন্তু কাটতি নেই বলে ভাল করে বিজ্ঞাপন দেন না।

অতএব অনুগৃহীত, অনুগ্রাহক বা অনুগ্রহার্থী বই কারও কাছে তার কোনও কৃতজ্ঞতা নেই। কথাটা কোথায় যেন সে একবার লিখেওছিল।

তবু ঝোঁকের মাথায় কসম ভুলে সে লিখে ফেলল "জল দাও।" ন্যাড়া আবার বেলতলায় গেল। তার একটা কারণ অন্যায় বোধ। তার মেজ মেয়ে একবার খাতায় লেখে "আমার বাবা একজন বিক্ষাত লেখক" এবং বাক্যটির তরজমা করে। ওই লেখাটা তার বুকে ক্ষত সৃষ্টি করে। বানানটা তো বটেই, বক্তব্যটাও যে ভুল।

শোধরাতে গিয়েই সে ভুলের ফাঁদে আবার পা দিল। "জল দাও" লেখাটাই ভুল, ছাপতে দেওয়া আরও ভুল। কোন মহলেই সাড়া শব্দ তেমন পেল না, প্রতিজ্ঞাটাই খালি জলে গেল। সুতরাং গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করতে তার উৎসাহ ছিল না। প্রকাশকের তাগাদার জবাবে ওয়াদা করে করে কাটিয়ে দিল ছয় মাস। অজুহাত, খানিকটা অংশ ফিরে লিখবে।

লিখতে বসে কিন্তু হাত সরল না। আরও কয়েকটি ঘটনা জুড়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে মূল বক্তব্যের তো ইতর বিশেষ হবে না। গায়ে গতরে বাড়লেই কি বই ভারী হয়? যে হত্যাকাণ্ডের আভাস আখ্যায়িকায় আছে, তাকে আর-একটু স্পষ্ট করলে বইয়ের পাঠযোগ্যতা হয়ত বাড়ে, কিন্তু তা-হলে ব্যাপারটা বিশেষ একটি রোমহর্ষক বৃত্তান্ত হয়ে দাঁড়ায়, নির্বিশেষে অনেকের তো হয় না!

তা-ছাড়া দূর, দূর, ভূমিকা লিখতে লিখতেই দম ফুরলো, বইটা ফিরে লেখার মজুরি পোষাবে না। মূল গল্পের জলের সঙ্গে এই ভূমিকাটুকু জুড়তে পেরে সপিণ্ডকরণকেই শুধু সম্পূর্ণ করা গেল।



জল দাও

এক

[ক]

"পিপাসায় এক ব্যক্তির মৃত্যু"—মনে পড়ে, খবরের শিরোনামা ছিল? আর যেহেতু শব সনাক্ত করা যায়নি তাই একদিন কাগজে তার ছবিও বেরুল।

সেই ছবি দেখলেন পাদরি পবিত্র বিশ্বাস, বুকে সোজাসুজি আর আড়াআড়ি ক্রুশ এঁকে যেই চোখ খুলেছেন, অমনই।

ছোটো-হাজরি সাজানো মেজ-এ রাখা কাগজটার, হাওয়া ছিল বলে, ছবিছাপা পাতাটাই বারবার বেরিয়ে পড়ছিল।

পিপাসায় মৃত্যু। খবরটা ক'দিন আগেই পড়েছিলেন, খরায়-খাক এই নিদারুণ বছরে ওটা একটা খবরই নয়, এবার ঝুঁকে পড়ে ছবিটাও দেখলেন।

চিনতে একটু সময় লাগল, পকেট হাতড়াতে হল চশমার জন্যে।

—'এ সেই লোকটিই না', জানতে চাইলেন স্মৃতি নামে বিশারদ

যে-কেরানি সব টুকে রাখে, তাকে। সেই লোকটাই। সেদিন কটকটে রোদ্দুরে গটগট করে উঠে এসেছিল বারান্দায়, ভণিতা বাদ দিয়ে এক গ্লাস জল চেয়েছিল।

জল এল, পাদরি পবিত্র বিশ্বাস লিপি উদ্ধার করে পড়লেন, সে খেল না। বলা উচিত, খেতে পারল না। গ্লাসে ঠোঁট ছুঁইয়ে এক ঢোঁক চুমুক দিয়েছিল বটে, কিন্তু বিষম একটা কাশিতে ছিটকে বেরিয়ে এল সবটাই।

থরথর গ্লাসটা নামিয়ে রেখে সে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "খেতে পারি না।"

—"কেন ?"

—"আটকে যায়। গলায় ঘা।"

"মাফ করবেন," বলেই সে এদিকে পিঠ ফিরিয়ে ওদিকে পা বাড়িয়েছিল, আমিই তার জামার কোণা ধরে টেনে রাখলুম।

—"একটু বসে যান। এখনও ঠা-ঠা রোদ্দুর।"

হাত ছাড়াবে বলে সে একটা মোচড় দিয়েছিল, পরে কিন্তু আপত্তি করল না। যেন ভিজে বেড়ালটি, বশবর্তী, বসল।

"তাই, বসেই যাই।" তার গলা সীসে নিষ্প্রভ অথচ চোখ দু'টি গনগনে। সহসা কাব্যোক্ত প্রাচীন নাবিকটি যেন উদিত হলেন। বাইরে, বেড়ার পাশে কৃষ্ণচূড়াটার ডালপালা চাঁচরে মেতেছে। তার চোখে কৃষ্ণচূড়া দেখে আমি ভয় পেলুম। কিংবা পেতুম, যদি না সময়টা দিনমান হত।

কতক্ষণ সে চুপ করে বসে রইল সেটা মাপার বরাত টিকটিক ঘড়িটাকে দিয়ে আমিও চুপচাপ ছিলুম।

হঠাৎ মাথা তুলে সে অস্বাভাবিক জোরে বলে উঠল, "আপনি

তো ধর্মযাজক, না ? ক্যাথলিক, কেমন ? আমার একটা স্বীকারোক্তি শুনবেন ?”

প্রস্তাবটা আচমকা, অপ্রস্তুত আমার উত্তর দিতে দেরি হল। প্রার্থনাটাকে দৃষ্টিতে কিয়ৎকাল প্রস্ফুটিত রেখে সে নিজে থেকেই যেন বুঁজে এল।

—“আপনার কোন আগ্রহ নেই ?”

তাড়াতাড়ি, যেন একটা তুলি দিয়ে, গলায় এক পোঁচ সহৃদয়তা বুলিয়ে নিলুম।

—“স্বীকারোক্তি করতে চান কেন।”

—“হালকা হব বলে। বলতে না পারলে আমার পাপের ভার লাঘব হবে কিসে !”

যদি তাকে অপ্রকৃতিস্থ না ঠেকত, যদি তার চোখ থেকে তাড়াতে পারতুম কৃষ্ণচূড়ার না-ছোড় ছায়াটা, তবে হয়ত শুনতুম। কৌতূহলটাকে জিভে-আসা জলের মত সুড়ুৎ করে টেনে নিতুম না।

কিন্তু তার হাত থেকে আসলে রেহাই চাইছিলুম বলে অন্য রাস্তা ধরতে হল।

খুব ধূর্ত, সুচিকাভরণ নিপুণতা ভরে দিয়ে ঠাণ্ডা প্রশ্ন করলুম, “তুমি কি বিশ্বাসী ?”

সে একেবারেই তৈরী ছিল না। দৃষ্টত কাঁপা আঙুলগুলো দিয়ে এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াল, যেন জবাব কোনও পকেটে লুকোনো আছে, শেষে সাদা কাগজের মত হতাশ স্বরে বলল, “তা তো জানি না।”

আমার ব্যক্তিত্বে আরও কয়েক কিলো ভারিক্কি বাটখারা চাপিয়ে বললুম, “তবে তো হবে না। বিশ্বাসী না হলে স্বীকারোক্তিতে ফল হয় না।”

হিন্দুদের শবের মত তাকে আমার চোখের সামনে ছাই হয়ে যেতে দেখলুম। অনেক পরে যা উঠে দাঁড়াল তা একটা নড়বড়ে কঙ্কাল।

কঙ্কালটা তার ছাই-ছাই ছায়াটাকে তার পিছে-পিছে কুকুরের মত টেনে টেনে নিয়ে গেল।

"ওর স্বীকারোক্তি আমি শুনিনি" অর্ধাস্পষ্ট ছাপা ছবিটার দিকে চেয়ে পাদরি পবিত্র বিশ্বাস স্বগত এই উক্তি করলেন, "কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা, ও পিপাসায় মরেনি।"

সেই মুহূর্তে খাস মুনশি স্মৃতি আর-একটা উৎফুল্ল পৃষ্ঠা মেলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে আহ্লাদিত হয়ে পড়লেন ধর্মযাজক।

—তা-ছাড়া, আমি ওকে একেবারে ফিরিয়ে দিইনি। সে উঠে দাঁড়াতেই অন্তত একটা হদিশ তো দিয়েছিলুম :

> "স্বীকারোক্তিতে ফল নেই, বরং তোমার গোপন কথা বল পাহাড় আর প্রান্তরকে। বন কিংবা নদীকে। ছড়িয়ে দাও গচ্ছিত বস্তুকে, তা-হলেই হালকা হবে।"

গিরজায় ঢং ঢং ঘণ্টা বাজছিল। যাজক তাড়াতাড়ি সাদা আলখাল্লায় আবৃত হয়ে পড়লেন। পিপাসায় মৃত বলে কথিত ব্যক্তিটির বিষয়ে আর ভাবনার সময় তাঁর ছিল না।

[খ]

সেই ছবি দেখলেন ওরিয়েণ্টাল ট্রেডিং কোমপানির সেক্রেটারি এ-জে-রে। ব্যস্ত হাত হু'টি প্রথমে দেখতে পায়নি, দেখেও দেখেনি, কিন্তু একটা টেলিফোন পেতে ছবির পাতায় ফিরে আসতেই হল।

কেন না স্বয়ং ডিরেকটর ওদিক থেকে ফোন ধরেছিলেন।

থারড পেজ বলছেন সার? তাই তো, এই তো থারড পেজই তো। দেখেছি সার, দেখতে পেয়েছি। সে-ই, আপনার ভুল হয়নি (আপনার ভুল হয় কখনো), আমিও চিনেছি। তিমির চাকলাদার নামে যে-লোকটি ফেরার হয়, সে। কাজেকর্মে কমপিটেন্ট ছিল, শুধু মাসকতক আগে মাথায় কেমন যেন ছিট দেখা যায়। মিড্‌ল এজেড্‌ সার, তবে কমকম দেখাত। বেশি নয়, হাজার বারো শো' মত খালি সরাতে পেরেছিল। দেন হি টুক হ্য পাউডার, উবে গেল আর কী। নো সার, হ্য লস্‌ মারসিফুলি ওঅজ নট মাচ। বেশি কিছু নয়। তবে পিপাসায় মারা গেল, হুশো মাইল দূরে— ওইটেই একটু খটকা লাগাচ্ছে। সারটেনলি সার, ওর নমিনির খোঁজ করব, পুলিসকেও জানাব। আগে জানিয়েছিলাম কিনা? নিশ্চয়ই

সার, নিশ্চয়ই ; লালবাজারে ডায়েরি করা আছে। (নেই, কারণ ও-টাকাটা ছিল যাকে বলে হিসাব বহির্ভূত টাকার পারট, যা শো করাই হয়নি, তা খোয়া গেছে জানাব কী করে)।

ফোন নামিয়ে সেক্রেটারি ফের কাগজটা নিয়ে পড়লেন। সন্দেহ কী, এই সে-ই। ঝাপসা ছাপা চোখ দু'টিও ঝাপসা। অথবা মরে গিয়ে ঝাপসা হয়েছে। কী করণীয় সেটা স্থির করতে হলে সিগারেট ধরিয়ে প্রাতঃকৃত্য সারতে হয়, শেভ্ করে দাঁড়াতে হয় শাওয়ারের তলায়। হায়, একটা বাথটাব-সমেত টয়লেটের সাধ ইহজীবনে আর পূর্ণ হল না।

চাকলাদার কাজের ছিল, চটপটে ছিল। ছিট ধরার আগে কিছুদিন, গুজব, পলিটিকসেও ভিড়েছিল। কিংবা সেটাও হয়ত ছিটেরই ফল।

যদিও সাবরডিনেট, তবু ওকে সেক্রেটারি বার দুয়েক বাড়িতেও ডেকেছিলেন। একবার ডিনারে।

টেবিলে বসিলে সবাই সমান, সুতরাং একটি গ্লাস পূর্ণ করে সেক্রেটারি ওর দিকে তাকিয়েছিলেন।

দু' হাত এক করে সে বলেছিল, 'খাব না। ওসব আমার চলে না।'

মিঃ রে পীড়াপীড়ি করেননি, শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মর‍্যাল কোনও আপত্তি, মানে······"

"মর‍্যাল ?" তিমির চাকলাদার স্থানকাল ভুলে এত জোরে হেসেছিল যে, রে চমকে গিয়েছিলেন। ওর চোখের চাউনি যদি অদ্ভুত মনে না হত তবে রে হাসিটাকে বে-আদপি মনে করতে পারতেন।

"চেখে দেখলে পারতে হে, দেখতে কিচ্ছু নয় নয়, একেবারে জলবৎ তরল।"

"যা কিছু জলবৎ আমার কাছে আর তরল নয় সার, কেমন আটকে যায়।"

সত্যিই তিমির খেয়েছিল খুব কম, আর রে লক্ষ্য করেছিলেন, জল প্রায়ই ছোঁয়ইনি।

"আশ্চর্য" আজ মিঃ রে সেই দৃশ্যটা মিলিয়ে নিতে নিতে ভাবলেন "আশ্চর্য মানুষের নিয়তি। গলায় ঘা, জিভে জ্বালা (তিনি তাই ধরে নিয়েছিলেন) বা যে-কারণেই হোক, সেদিন যার ছিল জলাতঙ্ক, সে কিনা কোন্ তেপান্তরের মাঠে জল পিপাসাতেই মরল?"

বোঝা গেল না। যেমন বোঝা যায়নি তার আকস্মিক অন্তর্ধানের ব্যাপারটা। সটকেই যদি পড়বে তবে অত কম টাকা সরাল কেন। ও কি তবে শুধু ক'দিনের পাথেয়ই হাত করতে চেয়েছিল।

রে সিদ্ধান্ত করলেন এই মনস্তত্ত্বও কালো টাকার মত একটা হিসাবের বাইরের ব্যাপার।

পুলিসকে জানানোর সময় ওই তছরূপের কথাটাও এবার যদি বলে দেন, কেমন হয়। দেবেন না, দেওয়ার উপায় নেই, কিল খেয়ে কিল হজম করতেই হবে, নাচার—তবু যদি, মানে, কথার কথা।

ওর নতুন করে কী আর সাজা হবে, জেলে যাবে?

অন্যমনস্ক ক্ষুরের ধারে রক্তের রেখা দেখা দিতেই মিঃ রে সম্বিৎ

ফিরে পেলেন, দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তা হয় না। যে ইতিমধ্যে মৃত, তাকে বোধহয় আর জেলে পাঠানো যায় না। হাকিম হুকুমও দেন যদি, জেলখানার ভিতরে লাশ পচবে, অন্য কয়েদীরা অবশ্যই আপত্তি জানাবে।

[গ]

বিসকুট ভেঙে ভেঙে কোলের কুকুরটাকে দিচ্ছিলেন মিসেস রীতা সিং, আড়চোখে ছবিটার দিকে চেয়ে ছিলেন। চেনা-চেনা ঠেকছে যেন। কপালের রগটা টিপে ধরতেই পরদা সরে গেল। হু বাট হী? দ্য সেম্ স্কাংক। হী ওঅজ রাইট হিয়র দ্য আদার ডে, অ্যানড, উড য়ু বিলীভ, হী সেইড্ হী হ্যাড কাম অল দ্য ওয়ে টু সেল পিকচারস।

বিসকুট না পেয়ে কুকুরটা কোল থেকে পড়ল লাফিয়ে, স্লিপার শুঁকল, শানটায় আঁচড়াল রেগে গিয়ে, প্রায় তখনই একটা লাল উলের বল দেখতে পেয়ে সেটার পিছনে ছুটল।

ছুটুক, মিসেস রীতা সিং আর পারেন না। আগে টেবিলে বসে নুয়ে পড়ে কুকুরকে খাওয়াতেন, এখন মোড়ায় বসতে হয়। বয়সই মোড়ায় নামিয়েছে। ঝুঁকতে গেলে পেটের খাঁজে লাগে, কষ্ট হয়।

নইলে বহির্বাসের তলায় শরীরটা আষ্টেপিষ্টে বাঁধা, ফিতেয় হুকে একটা সারকাসের মিনিয়েচার তাঁবু যেন। তবু চর্বিল শরীরটা স্থানে অস্থানে ফুলে-ফেঁপে থাকে, বাঁধনগুলোকে দেখিয়ে দেয়। পর পর কয়েকটা ব্লাউজ বগলে আর হাতার কাছে পটপট করে ফেঁসে গেল, স্লীভলেস হয়ে সেই দুর্ঘটনা না হয় এড়ানো গেছে, কিন্তু বাকীটা?

বাঁধা তো থাকে মিশরের মমিরাও, মিসেস রীতা ছবিতে দেখেছেন, কিন্তু কেমন অটুট, বদলায় না। মিসেস রীতা তাই মমিদের ঈর্ষা করেন, প্রমাণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মমির জীবন কতদিন কামনা করেছেন। সব প্রার্থনা পূর্ণ হয় না!

"মেমসাব, এক আদমি আয়া, আপ্‌সে মিলনে চাহ্‌তা।"

"কৌন?"

গর্ভভয়ে কিছুকাল যৌনবিহার ছেড়েছেন যিনি, মেদবৃদ্ধির ভয়ে সেই শ্রীমতী রীতা অধুনা দিবানিদ্রাও ছাড়তে চান; কিন্তু নিদ্রা তাঁকে ছাড়ে না, আক্রমণ করে, জাপটে ধরে, বুকে সাপটে নিয়ে সাহসী আঙুলে সর্বাঙ্গ শিথিল করাতে চায়। রোজই দুপুরে ঠিক এই সময়টাতে কাড়াকাড়ি চলে, আমেজটা মন্দ লাগে না। আজ বাধা পড়ল, রীতা সঙ্গতই বিরক্ত।

"কৌন্? কারড দিয়া?"

"নেহি তো মেমসাব। বহ্ তসবির লায়া।"

"তসবির?" এখন উঠে বসতেই হল রীতা সিংকে। কথাটাই কেমন অদ্ভুত লাগছে। শহরের বাইরে টিলার উপরে এই প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা বাংলোয় সচরাচর আগেভাগে খবর না দিয়ে কেউ তো আসে না।

"লোকটা তসবির বেচতে এসেছে মালুম হল মেমসাব।"

বেচতে এসেছে তাই বলো। লোকটা তবে ফিরিওয়ালা। ওই ক্লাসের লোকের ভিজিটিং কারড থাকবে কী করে, আছে কিনা জানতে চাওয়াই ভুল হয়েছিল।

ছবি বেচবে বলে এসেছে। শ্রীমতী রীতা ফিকে রং ডিসটেমপার দেওয়ালের দিকে তাকালেন! ন্যাড়া। ম্যানটলপিস? ন্যাড়া। অথচ ট্রফি-কিউরিওতে, গালচেয় গাব্বায় কামরা ঠাসা। ছবি নামক আবশ্যিক একটি কালচার উপচারেরই অভাব রয়ে গেছে।

দেখাই যাক না, ভেবে মিসেস রীতা উঠলেন, গড়াতে গড়াতে এগোলেন।

লোকটার চোখে কালো চশমা, মুখে দাড়ি, তবে মোটামুটি ধোপত্থরস্ত, হাতে ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেট।

রীতা আশা করেছিলেন তিনি গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটি কেতামাফিক সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াবে, দাঁড়াল না বলে তিনি ভিতরে আহত, একটু অপমানিতও বোধ করলেন।

লোকটি তো দাঁড়ালই না—বরং মিসেস রীতাকেই পাশের আসনটি দেখিয়ে দিল।

যেন আজকের এই তুপুর আর রীতারই বাংলোর এই অংশটুকু সে ইজারা নিয়েছে, সর্বময় কর্তৃত্ব তার।

লোকটি অলৌকিক কোন ফিরিওয়ালা।

সবটাই এমন অসম্ভব অবাস্তব ঠেকছিল রীতার যে, অবাক হবারও শক্তি ছিল না। হাত বাড়িয়ে পাখাটাকে পূর্ণবেগ করতে হল। লোকটির চোখে অস্বস্তি ধরা পড়ে যাবার ভয়ে কপাল আর গলার ঘাম মোছা হল না।

—বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন।

এক পক্ষের স্পর্ধা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন অপর পক্ষের রোষ ধীরে ধীরে মজার চেহারা নেয়।

রীতারও তাই হল। দেখাই যাক না কতদূর গড়ায়, আগন্তুকের দৌড় কতদূর। এটা একটা খেলাও তো বটে। তুপুরে একঘেয়েমির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে রীতা এই অপ্রত্যাশিত, অপ্রাকৃত দৃশ্যের কাছে আত্মসমর্পণই শ্রেয় বিবেচনা করলেন।

—"বের করি ছবি ?" আগন্তুক কেমন ঘর্ঘরে, ইচ্ছাকৃত বিকৃত গলায় বলছিল, চেনা ঢং তবু রীতা ধরি ধরি করেও ধরতে পারছিলেন না।

—"বের করি ?"

—"কিসের ছবি ?" রীতা অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন। —"কার ?"

—"তোমার।" একটি নির্মম আদেশের মত গম্ভীর শোনাল কণ্ঠ।

ততক্ষণ আগন্তুক খুলে ফেলেছে হাতের প্যাকেট, চিত করে ছড়িয়ে দিয়েছে সব ছবি।

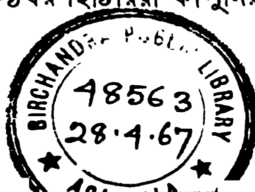
খুলে পড়েছে তার চোখের কালো চশমাও।

—"চিনতে পারছ না আমাকে, না, তোমার নিজের ছবিকেও না ?"

—"পেরেছি।" রুদ্ধশ্বাসে বললেন রীতা। তারপর নিজের ডাঙায় নিজে দাঁড়াবার শেষ, মরীয়া চেষ্টা করে বললেন, "কী মতলব তোমার।"

—"মতলব কিছু নেই মেমসাব, বলেছি তো, তসবির নিয়ে এসেছি। তোমার নিজের ছবি, ভালো করে চেয়েও তো দেখলে না। দেখলে ঠকতে না কিন্তু। একটা হারানো জমানা, খোয়ানো চেহারা ফিরে পেতে! এই যে একে চিনতে পার? টেনিস কোর্টের এই মেয়েটির নামও ছিল রীতা। কমলিকার রোল-এ স্টেজ-এ নাচছে যে, রীতা সে-ও। তুমি আজ আর খেলতে বা নাচতে পার না মিসেস সিং, কিন্তু এই মেয়েটি পারে। এই অ্যালবাম বিশ্বাসী মহাফেজখানার মত সব কিছু ধরে রেখেছে, কিছু বদলাতে দেয়নি, অথচ তুমি ৪৫-৪৫-৪৫ হয়ে গেছ।"

—"অসভ্য ব্রুট, ব্ল্যাকমেলার", ফুঁসে উঠলেন মিসেস সিং, "তোমাকে—তোমাকে আমি পুলিসে দেব। গেট আউট, গেট আউট—" কণ্ঠস্বর হিস্টিরিয়া কাঁপুনির মত হয়ে গেল।


BIRCHAND... PUBLIC LIBRARY
48563
28·4·67

আগন্তুক হাসল। —"আমি আমার সময় খুইয়েছি, তাই যাদের সেকাল আমার কাছে গচ্ছিত আছে, তাদের সব ফিরিয়ে দিয়ে ছুটি নেব ভেবেছিলুম, তা হল না। চলি।"

উঠে দাঁড়াল আগন্তুক। পুরু চামড়ার খোলা পিরেনটার ফাঁকে বুকের লোম কাঁচা-পাকা।

এই গলদঘর্ম তুপুরে ও ফিরে যাচ্ছে যখন, তখন অসমর্থ অসহায় ওকে একটা আতঙ্ক বলে ঠেকছে না। লোকটি আজকের ৪৫-৪৫-৪৫ রীতাকে তার পুরনো সময় ফিরিয়ে দেবে বলে ঠিকানা খুঁজে এসেছিল।

চিৎকার করে রীতা বললেন, "মালী! ফটক বন্ধ করো।" ফিরে বললেন, "আয়া! ঠাণ্ডা পানি!"

ফ্রিজের ফোকরে দপ্‌দপ মাথাটাকেই শুধু রাখা গেল না।

সেই লোকটিই কিনা মাস ফুরতে না ফুরতে এক বেওয়ারিশ মাঠে তেষ্টায় মারা পড়ল! আঃ, নিশ্চিন্ত। আর কোনদিন কেউ তার তুপুরকে ধর্ষণ করে যাবে না!

লোকটির ময়লা জামাটা থেকে বিশ্রী গন্ধ আসছিল। এতদিন পরে, এত দূর থেকেও রীতার নাকে এসে লাগল।

ওই পিরেনটার তলায় পচা-গলা একটা শরীর লুকনো ছিল না তো! এই প্রথম রীতার মনে ছাপা ছবিটার সঙ্গে প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ এল। তৃষ্ণায় মৃত বলে নির্ধারিত হবার ঢের আগেই হয়ত লোকটির মৃত্যু ঘটেছিল। ছবি ফিরি করতে এসেছিল একটা সাজপোশাক-পরা লাশ।

শুধু সে তার গায়ের তুর্গন্ধ ঢাকতে পারেনি!

এতদিন পরেও মিসেস রীতার পায়ের পাতা থেকে মাথার চুল অবধি একটা আতঙ্ক ছোট ছোট ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে গেল।

[ঘ]

ঝাপসা ছবিটা একটু-একটু করে প্রকট স্পষ্ট হয়ে আবার আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে এল, হাতের মুঠোয় কাগজটা মোড়া, নার্স স্বাতী সেন তখনও কাঠের পুতুল হয়ে বসে ছিল।

ছবিটা নয়, তার চোখই ঝাপসা, টের পেতেই তার হাত থেকে কাগজটা খসে পড়ল।

তার আগেই আহ্নিক আইন অনুসারে নিযুক্ত ডোমগুলো সোল্লাসে দিনের লাশটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই দূর অঞ্চলে খবরের কাগজ শেষ বেলায় আসে।

স্বাতীর শীত করছিল। তদুপরি নিজেকে বোধ হচ্ছিল যেন নি-সুতো একটি নগ্নিকা, বিষণ্ণ কোনও পটভূমিতে প্রলম্বিত এবং স্থির। কিংবা নির্বাসিত দূর প্রান্তরে প্রোথিত একটি প্রতিমা যেন।

আকাশে মেঘ জমছে, ছায়া নামছে। আজও বৃষ্টি হবে। ওই মেঘ দূর থেকেই একখণ্ড মলিন বস্ত্রও ছুঁড়ে দিত যদি, স্বাতীর লজ্জা বাঁচত, অঙ্গ রক্ষা হত।

সেদিনও বেলা যেতে না যেতে মেঘ ছেয়ে গিয়েছিল! আকাশ হয়েছিল প্রতীক্ষায় জমাট একটি পাথর।

কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে রাত্রি রাজার মত নেমে এসেছিল।

সদ্য স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে স্বাতী, চুল ভেজায়নি কিন্তু ঢেলে দিয়েছে সারা পিঠে, কণ্ঠতট তখনও সিক্ত সৈকত, সরল অঙ্কের দ্বিতীয় বন্ধনীপ্রতিম ছোট জামাটা পরা হয়নি সুতরাং যৌবন অনতিরঞ্জিত, অনুচ্চস্বর, বাড়িতে তো কেউ নেই, কে আর দেখছে এই বিশ্বাসবশে শাড়িটা শরীরের আয়নায় আলগা, আলগোছ, অপ্রয়াসী একটি আবেশের মত।

"কে ?"

ছায়া দেখে ভয় পেয়েছিল কি স্বাতী ? ভিজে পায়ের ফিরতিমুখী ছাপ আঁকা হয়ে হয়ে গেল শানে, তাড়াতাড়ি আবার ঢুকল গিয়ে স্নানঘরে, ছিটকিনি তুলে দিল।

অকপট শরীরটা গুছিয়ে নিতে সময় লাগে ; সময় লাগে সাহসকে আঙুলের অগ্রভাগে তুলে হৃদিমধ্যে স্থিত করতে।

সহজ, শোভন, সাহসী হয়ে বেরিয়ে এসেও তবু আলোটা জ্বেলে দিতে ভুলে গেল।

"চিনতে পেরেছ ?"

"তিমির, অপমান কোর না।"

"আমাকে বসতে বলবে না স্বাতি ?"

অস্ফুট গলায় স্বাতী বলতে গেল "বোসো", কিন্তু ঘরে আছে তো মাত্র ওই বিছানাটাই। তাও চাদর বদলানো নয়, কোঁচকানো, সারা দিন ডিউটির পর ফিরে স্বাতী ওখানেই উপুড় হয়ে ছিল।

"ফিরে এলাম স্বাতি।"

"ফিরে এলে!" স্বাতী যেন নিথর একটা দেওয়াল, একটি ধ্বনিকে প্রতিধ্বনির মত ছুঁড়ে দিল।

"কী করে এলাম, জিজ্ঞেস করলে না তো।"

"কী করে।"

"খবর নিয়ে, খুঁজে, শুঁকে শুঁকে। স্বাতি, আমাকে গোয়েন্দা বা কুকুর যা খুশি বলতে পার।"

কথা নেই।

"স্বাতি, এবার জিজ্ঞেস কর, কেন এলাম।"

"কেন।"—সম্মোহিত একটি পুনরুক্তিমাত্র।

"থাকগে। স্বাতি, তুমি কিছু শুনছ না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঝিমোচ্ছ, আমি দেখতে পাচ্ছি।"

"আমি খুব ক্লান্ত, তিমির। সারাদিন হাসপাতালে, শক্ত একটা অপারেশন কেস। লোকটা এক রকম ছিল ক্লিনিক্যালি ডেড, তাকে বাঁচাতে···আমি আজ ভীষণ ক্লান্ত।"

"ক্লান্ত, স্বাতি, আমিও। তাই তো আশ্রয় নিতে এলাম। অনেক ঘুরলাম, আর পারি না। আমি একটু ঘুমোতে চাই, স্বাতি, তুমি শুধু বসে থাকবে, মাথা রাখব তোমার কোলে, আমার কান থাকবে তোমার নাভিমূলে, তোমার নত স্তন আমার চোখের পাতা ছোঁবে, আর তোমার আঙুল।···আমার চুলে তোমার ছোঁয়া ছড়িয়ে যাবে। যাবে না?"

"কিন্তু তোমার আরও তো কেউ ছিল।"

"ছিল, নেই। কেউ না। জানি তুমি রীতার কথা বলছ। ছিঃ, স্বাতি, তোমার নাম ক্ষমা, ছোট হিংসা তোমাকে মানায় না। তোমাকে তুচ্ছ করে একদিন রীতার পেছনে ছুটেছিলাম, তুমি এই কথাটা ভুলতে পারছ না?"

"তিমির, মনে করিয়ে দিও না।"

"রীতা অনেকদিন হল রীতা সিং, সুখী, মেদল, সম্পন্না।"

"তাই এসেছ?

"আমি শুধু বলতে চাইছি, সে বদলে গেছে। বদলে গেছি আমিও। ক্ষয়ে যেতে যেতে ফুরিয়ে এসেছি। কিন্তু তুমি বদলাওনি স্বাতি। যেমন ছিলে তেমনই আছ। সেই মন, সেই শরীর, অভিমানে স্ফুরিত আত্মসম্মানে সমুন্নত। আমরা যা পারি না তুমি তা পেরেছ।"

"একটু চুপ কর।"

"চুপ করব, যদি তুমি মুখ খোল। সহজ হয়ে বোসো না একবারটি। তোমার হাসপাতালের কথা বল। ক্লিনিক্যালি মৃতপ্রায় সেই পেশেনটটিকে কী করে বাঁচালে সেই গল্প। আমিও তারপর তোমাকে একটা গল্প বলব স্বাতি, ক্লিনিক্যালি জ্যান্ত, অথচ সর্বত মৃত একটি লোকের গল্প।"

"তিমির, আমার ভয় করছে।"

"ভয় আমারই কি কম স্বাতি। হাত দিয়ে দ্যাখ, গলার এইখানটায় জমে আছে, শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে। তাই আমার কিছুকাল যাবৎ ঠাণ্ডা জলের গ্লাস ছুঁতে ভয়, স্নানে ভয়। আমি জানি কিনা আমি খুনী।"

বলেই কেমনতর গলায় হেসে উঠতে গেল তিমির, স্বাতী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ওর মুখ চাপা দিল। পাশেই আরও অনেক কোয়ারটার, ওরা যদি ছুটে আসে, মাথা কাটা যাবে, তুমি যাও. তুমি এক্ষুনি যাও তিমির।

[৬]

'জানি কিনা, আমি খুনী!'

খবরের কাগজে ছবিটা চোখে পড়ামাত্র ওসি নটবর সাহার কানে কথা কয়টি বেজে উঠল।

এ-লাইনে তিনি অনেক দিন, একটা স্বীকারোক্তি আদায় করতে ঢের-ঢের শাস্ত্রসম্মত টোপটা প্রয়োগ করেও হাঁপিয়ে যান, আর না চাইতেই জল, এক আজব চিড়িয়া কিনা সটান খাঁচায় ঢুকে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে এক মারাত্মক জবানবন্দী দাখিল করতে চায়?

টেলিফোনে উপরওয়ালা তখন বাপান্ত করছেন, ওসি, অতএব, লোকটা কখন কী করে ঢুকল টের পাননি।

—"কে আপনি?"

নাম জিজ্ঞাসা করতে সে কুমির না তিমি গোছের অদ্ভুত একটা নাম বলেছিল, ও-সব খটমটে কথা ওসি-র মনে নেই, তিনি এক দৃষ্টে লোকটির চোখ-চেহারা-পোশাক নজর করছিলেন।

বলতে যাচ্ছিলেন "বোসো", মনে মনে প্রুফরিডারের মত কেটে শুধরে বসালেন "বসুন।" কেননা কিসে কী হয় বলা যায় না, আজকাল আবার কথায় কথায় শুনতে হয় পুলিশ নাকি পাবলিক

সারভেণ্ট। এই লোকটা কেউ হোক আর কেটা হোক্, পাবলিক মানে সেই মহামায়ারই অংশ তো?

"কী চান।"

"এজেহার দিতে এসেছি।"

"কী সম্পর্কে, মানে কার বিরুদ্ধে।"

"আমার।"

ওসি নটবর সাহা তখনও লোকটিকে জরিপ করছিলেন।

"আমার বিরুদ্ধে আমি এজেহার দেব—কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না দারোগাবাবু?"

লোকটির চাউনি থেকে ততক্ষণ দারোগাবাবু নিজস্ব একটি বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন, সুতরাং ও-সব কথার মারপ্যাঁচে ধরা দিলেন না।

"কী করেছেন বলুন।" যেন কোনও নীরস দোকানী বলল 'কড়ি ফেলুন।'

"খুন।"

টের পেয়ে গিয়েছেন কিনা লোকটির দু' একটি স্ক্রু ঢিলে, দারোগাবাবু তাই তটস্থ হলেন না, সিগারেটের রিং-এ মজাটাকে নাচাতে নাচাতে বললেন, "কাকে?"

এইবার লোকটি যেন একটু অপ্রস্তুত হল।—"সেটাই তো জানি না, দারোগাবাবু। আপনার কাছে সেজন্যেই আসা। এজেহার লিখে নিন, তাকে সনাক্ত করুন।"

"মশায়, অসম্ভব কথা বলছেন আপনি। খুন করেছেন, এত দূর পর্যন্ত কবুল করে আমাদের কাজটা তো সোজা করেই দিয়েছেন, এবার আরও একটু সহজ করে দিন না। ঝেড়ে কাসুন—কবে, কোথায়, কাকে, কীভাবে, সব বলুন।"

"বলছি", লোকটা ক্রমশ চুপসে ছোট হয়ে যাচ্ছিল—"একটু জল।"

জল এল, কিন্তু খেল না লোকটি। সস্নেহে গ্লাসটার চারপাশে আঙুল বুলিয়ে আদর করল।

"আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না দারোগাবাবু, কিন্তু সত্য বই মিথ্যা বলব না, আমি কাউকে আলবত খুন করেছি। ভাল করে চেয়ে দেখুন তো, আমার নখে দাগ নেই, কিংবা জামায় রক্তের ছিটে? না, নেই।"

লোকটি নিজেই পরখ করে নিজেই হতাশ হয়ে যেন রায় দিল, "না, নেই। থাকবে না, জানতাম। আমি একবারে তো তাকে খতম করিনি, অনেক দিন ধরে, একটু একটু করে, অন্ধকারে। তার মুখ আমি দেখতে পাই না, কিন্তু মারতে বিশ্বাস করুন, আটকায় না।"

তার গলায় অপ্রাকৃত যে বিহ্বলতা ফুটে ছিল, দারোগাবাবু তাকে আমল দেননি, ওদিকে জরুরী আর-একটা টেলিফোন এসে পড়তে মজা করার ফুরসতটাও ফুরিয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং ব্যস্ত হাতে ঘন্টি বাজান তিনি, সেলাম-কাঠ জমাদারের হাতে লোকটিকে জিম্মা করে দেন।

তারপর কী ঘটেছিল তিনি জানেন না।

[চ]

ছবি দেখে সাপ্তাহিক "মরমী" পত্রিকার সম্পাদক মৃগাঙ্কমোহনের মনে পড়ল, সেই ফাইলটা এই অফিসেরই কোথাও আছে, টেবিলের টানায়, আলমারিতে অথবা রদ্দি কাগজের স্তূপে। ফেরত যায়নি নিশ্চয়, কারণ পাণ্ডুলিপিতে ঠিকানা ছিল না।

মনোনীত বা অমনোনীত—কোন ক্লাসেই লেখাটা পড়ে না।

সত্যি বলতে কী, লেখাটায় কি ছিল, সম্পাদক মৃগাঙ্কমোহন জানেন না। অদ্যাবধি পাতা উলটেও দেখেননি। প্রথম কারণ সময়ের অভাব, দ্বিতীয়ত উৎসাহের। তৃতীয়ত ওই হস্তাক্ষর, হিজিবিজিতে ঠাসা, কাটাকুটি গোলকধাঁধা। সুভাষিত পদ্য যাই বলুক, ছাই দেখে ওড়াতে গেলে সচরাচর ছাই-ই মেলে, অমূল্যরতন প্রায় কখনও না।

"একটা লেখা এনেছি, দেখবেন ?"

ওই ছবিটা এতদিন পরেও অবিকল সেই গলায় কথা কয়ে উঠল। সম্পাদক নিজেকেও বলতে শুনলেন—"না।"

"দেখবেন না ?"

"না। নতুন লেখা আমরা দেখি না।"

"ভাল হলেও না ?"

"না। চানস নেই। ওই দেখুন না, মনোনীত রচনারও ফাইলবন্দী ডাঁই! বোবা কিউ!" সমসাময়িক একটা উপমা দিতে পেরে মৃগাঙ্কমোহন হৃষ্ট হলেন।

"কিন্তু আমার যে অনেক কথা বলার ছিল।"

"বলার কথা যখন, তখন বললেই তো হত, লেখার দরকার ছিল কী।" হাতে কাজ না থাকলে যেমন কাগজে আঁকিবুকি কাটেন, মৃগাঙ্ক তেমনই কথার পিঠে কথা দিয়ে নকশা কাটছিলেন।

লোকটি রসিকতাটা ধরতে পারল না, বোকার মত বলল, "বলব কী করে।"

"কেন, লোকজন জড়ো করে। কথকতা, পাঁচালি গান,— আমাদের দেশে ফরম-এর শেষ আছে নাকি।"

নাছোড় লোকটির হাতের মুঠো ক্রমশ খুলে আসছিল, ধরবার কিছু ছিল না বা সে পাচ্ছিল না। অবশেষে যেন শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল, "একবার পড়ে দেখলে পারতেন কিন্তু। একটা সাংঘাতিক ঘটনা ছিল।"

"কী রকম সাংঘাতিক ?"

"খুন।" খুব সীরিয়স হয়ে গিয়ে, যেন আলো নিবে গেল, এখুনি নাটক শুরু হবে, লোকটি বলেছিল, "প্রথমেই একটি খুনের স্বীকারোক্তি আছে।"

"তার মানে, গোয়েন্দা গল্প বলুন। তা মশাই গোয়েন্দা কাহিনী যত রোমহর্ষক হোক, আমরা ছাপি না। তা ছাড়া—" চাউনি ছুঁচলো করে সম্পাদক বললেন, "তা ছাড়া গোড়াতেই স্বীকারোক্তি থাকলে গোয়েন্দা গল্প জমে না। সাসপেন্স কোথায় ?"

ক্রুদ্ধ, আহত, কঠিন একটা ভঙ্গিতে সে বসে ছিল খানিকক্ষণ, তার ঠোঁটের কোণে ক্রমশ কষ দেখা দিল, হাত কাঁপতে শুরু করল, চোখের পাতা পড়ল ঘন ঘন, মৃগীরোগী নাকি, মৃগাঙ্ক বিব্রত, ঢাকা জলের গ্লাসটা থেকে ওর চোখে মুখে ঝাপটা দেবেন কিনা ভাবলেন কিছুক্ষণ।

গোঁ-গোঁ করেনি বটে, তবে সে গোঁজ হয়ে ছিল, ঘাড় নীচে, দৃষ্টি মেঝেয়। উঠতে গিয়ে টলল বোধ হয় একবার, কি টলল না, তারপর নির্বাক্‌, "আসি"-টুকু বাদ দিয়ে সহসা প্রস্থান করল।

সে চলে যাবার বেশ খানিক পরে মৃগাঙ্কর খেয়াল হল, খাতাটা রয়ে গেছে।

আশ্চর্য, লোকটি পরেও কিন্তু ফেরত নিতে এল না।

এতদিন পরে তাঁরই টেবিলে ছাপা ছবি হয়ে লোকটি ফিরে এসেছে। যশের পিপাসা যাকে অধিকার করে ছিল, সেই লোকটি কিনা প্রান্তরে প্রাণ দিল পিপাসার ঘোরে।

"মরমী"-সম্পাদক খুঁজে বের করে বেওয়ারিশ পাণ্ডুলিপিটির ছেঁড়াখোঁড়া পাতা উলটে গেলেন।

দুই

[ক—তার ডায়েরী]

আমি খুন করেছি।

আমি শ্রীতিমিরকুমার চাকলাদার, হাল সাকিন যার কলকাতা।

শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সাকসেস-এ আমি একটি মাঝারি মাপের মানুষ, বাইরে থেকে দেখতে প্রাণোচ্ছল, পরিপাটি।

আমি চাকরি করি, বই পড়ি, ছবি দেখি, গান শুনি, টেস্‌ট ক্রিকেটের টিকিট কিনি, আড্ডা দিই, মাঝে মাঝে ছুটিতে বেড়াই।

এইসব নিয়মিত বরাদ্দ দানাপানিতে দিব্য তৃপ্ত ছিলুম, যদিও অবিবাহিত। ঘোড়দৌড়ের মাঠে কখনও যাইনি, কেননা ওই এলাকা আমার খড়ি-আঁকা, মধ্যবিত্ত সাহস, ভীরুতা, রুচি প্রভৃতি দিয়ে মাপা গণ্ডীর বাইরে।

সেই আমি কিনা খুন করলুম, ঝোঁকে নয়, মাথায় হঠাৎ রক্ত

চড়ে নয়, ঠাণ্ডা ভাবে, থেকে থেকে, গোপনে। জানি না, সবাই করে কিনা, বা আর কেউ কোন কালে করেছে কিনা।

আমার এই ধারণার অন্ত কোথায় কে জানে, কিন্তু একটা আদি আছে।

বেশ তো ছিল, সেদিন জুয়ায় বসলুম কেন, বসলুম যদি হারলুম কেন। আর সেই শোক ভুলতে ঢকঢক মদ কেনই বা গিললুম।

"কেন আফিং খাইলাম"—কমলাকান্তের এই প্রশ্ন আমাকে বিদ্ধ করছে। কার যে কিসে কী হয়। কেউ ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে হঠাৎ শোনে "বেলা যায়।"

মাঝরাতে আমি রাস্তায়, সাঙাতদের যারা সঙ্গ নিয়েছিল তারা যে-যার গলির মোড় চিনে চিনে সটকে পড়েছে। হঠাৎ দেখি, আমি একা। একটা ভয় আমাকে যেন বেওয়ারিশ ঘোড়া পেয়ে টক করে সওয়ার হয়ে বসল আর হাঁটাতে থাকল।

না হেঁটে উপায়ও ছিল না। তখন বাস বন্ধ, ট্যাক্সি নেই, থাকলেও লাভ নেই, কারণ ট্যাঁক ফাঁকা। ফাঁকা ময়দানেই বা এসে পড়লুম কী করে, সে একটা অনাবিষ্কৃত রহস্য। আকাশে টলটলে জ্যোৎস্না, নেশার কৃপায় মগজও টলটলে, আমি সুতরাং আমার ভাড়াকরা খোঁয়াড় পিছনে ফেলে হাঁটছি তো হাঁটছিই, যা থাকে কপালে।

এখন বুঝতে পারছি সওয়ার ছাড়া একটা সহিসও ছিল, আমাকে নাকে সুতো বেঁধে সমুখ পানে টানছিল, তার নাম নিয়তি।

তার পরেই ঝড় উঠল। শাঁ-শাঁ-শাঁ—ধুলো ধুলো ধুলো, ঝিমিয়ে-পড়া গাছগুলোকে যেন চুলের মুঠি ধরে ধরে জাগিয়ে দিয়ে গেল। আর যে-ময়দানটা ইন্দ্রের মত লম্পট, সহস্রাক্ষ, তার একটার পর একটা চোখ গেলে দিতে লাগল।

অনেক ডালপালা মড়মড় করে ভেঙেছিল নিশ্চয়, নইলে মুখ থুবড়ে পড়ব কেন। মাথা তুলে দেখি, ইতিমধ্যে এক চোট বৃষ্টি হয়ে গিয়ে আকাশ শ্বেতচন্দনচর্চিত ললাটপ্রতিম। ভয় ছিটকে পড়েছে, তবু পিঠ ভারী, বুক ভারী। সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট। একটা গ্লানিবোধ, আমার নতুন সওয়ার।

আজ অবধি তাকে নামাতে পারিনি। মাথা নামালে আমি তার আকারও দেখতে পাই, তার হিসহিস শাসানিও শুনি। প্রথমে বলত, কার কাছে কী যেন চুক্তি করেছিলুম, খেলাপ করেছি। শেষের দিকে তো গলা বাড়িয়ে বলতেই শুরু করল, আমি খুন করেছি।

করেছি নিশ্চয়ই, নইলে ও বারবার বলবে কেন। থেকে থেকে পাঁজরে অশ্লীল চাপড় মেরে মেরে বলে, বিশ্বাসটাকে যেন আমার ভিতরে সেঁধিয়ে দেয়।

জাহাজঘাটায় একবার আবছা সন্ধ্যায় দেখেছিলুম উঁচু উঁচু ক্রেন, নীচে পিঠের উপর মালের বোঝায় কুঁজো কুলিরা সাবধানে পাটাতনে পা ফেলে এগোচ্ছে।

নিজেকেও আমি ওই সারি সারি ন্যুব্জপৃষ্ঠ মালবাহীদের ছবির সামিল করে দেখি। অপরাধের বোঝায় ধনুকের আকার—পা টেনে টেনে পথ ভাঙছি।

আমার সেই পাওনাদারের নাম জানি না, যার কাছে চুক্তিভঙ্গ করেছি।

প্রক্রিয়াটার শুরু কবে ভাবতে গেলে ভাসা ভাসা কয়েকটা ছবি শুধু মনে আসে।

যেবার খুব বর্ষা হল মফস্বলের সেই ছোট্ট শহরে, খাল ছাপিয়ে গেল জলে, নানা গ্রাম থেকে হাটুরেদের অনেক নৌকো গঞ্জে এসে লাগল, সেবার একটি ছেলে ক্লাস পালিয়ে পাশেই হেড মাস্টার মশায়ের কোয়ারটার, তার জানালায় টোকা দিল। চাপা গলায় ডাকল, "মিনি।"

বেরিয়ে এল একটি ছোট মেয়ে। ঘুমোচ্ছিল, গাল ফুলোফুলো, বলল, 'কী ?'

"পরে বলব, আগে তোকে একটু দেখি।"

আপনা থেকেই মেয়েটি ফ্রকের কোণা ধরে টেনে টানটান করে ধরল। দুটো পা এক সঙ্গে জড়ো করল, সেও সংস্কার বশে।

হাঁটুর ঠিক নীচেই একটা লালচে দাগ। লালচে দাগ গালেও, কনুয়েও। ছেলেটি যত খুঁটিয়ে দেখছিল, মেয়েটি তত কুঁকড়ে, বেঁকে, যেন এতটুকু হয়ে আসছিল।

"যখন ঘুমোচ্ছিলি, তোকে মশা কামড়েছিল, না রে!"

"কী জানি।"

"নইলে অত লালচে দাগ!" ছেলেটি উপর দিকে চেয়ে দেখল বৃষ্টি নেই। বলল, "আয় না।"

"কোথায় ?"

"আয় না।"

তারপর তার হাত ধরে টেনে দে ছুট, এক দমে খাল পাড়।

মাঝি নেই এমন একটা বাঁধা ডিঙ্গি ছেলেটি খুঁজে বের করল। লাফিয়ে উঠল নিজে, হাত বাড়িয়ে তুলেও নিল।

"পায়ে কাদা লেগেছে, মুছে দিই, আয়।"

তৎক্ষণাৎ প্রার্থনার ধরনে বসে পা দুটো ফ্রকের তলায় চালান করে দিয়ে মেয়েটি দুষ্টুমি করে বলল, "মুছবে কী দিয়ে।"

"হাত দিয়ে।"

নৌকো কাছি-ছুট হয়ে আপনা থেকেই খানিকটা এগিয়ে গেছে, কাঁপছে।

"এই, তোর ভয় করছে ?"

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে কী বলল, বোঝা গেল না।

"ভয় নেই, একটুখানি জল, হাওয়া নেই, ঢেউ নেই, ডুবব না।"

মেয়েটি বড় বড় চোখ তুলে তাকাল। কথা বলল এতক্ষণে।—"জানি। এত কম জলে কেউ ডোবে না।"

"তা-ছাড়া ভয় কী, আমি ধরে ফেলব। ধরে রাখব।"

মেয়েটি ধূপের ধোঁয়া ছড়ানোর মত খুব মৃদু, লঘু, প্রায় অলক্ষ্য হাসছিল। মুখ টিপে বলল, "কতক্ষণ।"

"যতক্ষণ পারি।"

"তুমি খুব কথা শিখেছ। আর—"

"আর কী।"

"আর পাকা হয়েছ।"

মেয়েটি খিল খিল করে হাসল, না নৌকোর গায়ে হঠাৎ কয়েকটা ছোট ঢেউ ছলকে গেল বলে ও-রকম শোনা গেল, ছেলেটি স্থির করতে পারল না। সুতরাং কথার খেই ধরে বলল, "পাকা হব না! বা-রে, চন্দ্রশেখর পড়িনি বুঝি। জানিস, গোটা বঙ্কিম গ্রন্থাবলীই শেষ হয়ে এল!"

"পাকা, পাকা"—মেয়েটি বলতে থাকল জোরে জোরে, যেন ছোট ছোট ঢিল তুলে নিয়ে ঢেউগুলোর গায়ে ছুঁড়ছিল। হাত বাড়িয়ে, প্রায় শুয়ে পড়ে একটা সাপলা ফুল ছিঁড়ে আনতে গেল সে, নৌকো কাত হল, ছলাৎ করে জল উঠল।

ডাঁটা ফুল সমেত মেয়েটি টাল সামলাতে ছেলেটির বুকের কাছে উঠে এল।

হু একটা বিচলিত বক সেই খবর রটাতে রটাতে পাখা মেলে উড়ে গেল।

"তুমি শক্ত করে এই কাঠটা ধর।"

এই প্রথম "তুমি।" মুখে তুমি এল, সে কি শারীর ঘনিষ্ঠতাজনিত কোন সুখাবেশে, অথবা পরিবেশ প্রকৃতই প্রগাঢ় হয়ে এসেছিল বলে, তার কোন মাপযন্ত্র নেই।

বেলা পড়ে আসছে, আলোতে এখন বেগ্‌নি ভাগই বেশি, খালের যে-অংশ নৌকোর আওতার বাইরে, তাতে খুব কচি জামরুলের রঙ ধরেছে।

এক হাতে হাল, ছেলেটি অন্য হাতে মুখের ব্রণ খুঁটছিল। কী বিশ্রী, কালচে ছোপ ছোপ, আজকাল আয়নার সামনে দাঁড়াতে লজ্জা করে। চোখ বসা-বসা, গাল চোয়াড়ে।

"আমি উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী গলার হার।"

যাত্রা শুনে মুখস্থ একটা গানের কয়েকটা কলি প্রবল জ্বরের মত ওকে ভিতর থেকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল, ছেলেটি চেষ্টা করেও তাদের চাপা দিতে পারল না, স্বত-উৎসারিত কয়েকটা ভাঙা স্বর গলা চিরে বেরিয়ে গেল।

সলজ্জ অপ্রতিভভাবে ছেলেটি বলল, "আমার গলা নেই, না? গাইতে গেলেই কেমন ঘর্ঘরে হয়ে যায়। আজ বছরখানেক ধরে এই হয়েছে। তা-ছাড়া এই গোঁফ, নীলচে ছোপটা দেখতে পাচ্ছ।"

শেষাংশটুকু ছেলেটি উচ্চারণ করল জোর দিয়ে, আপনাকে পুরুষ-প্রত্যয়ে, সগর্বে।

মেয়েটি কৌতুক, কৌতূহল, বিস্ময় আর মায়া দিয়ে চোখের পাতার পসরা সাজিয়ে চেয়েছিল।

"আর ?"

আরও কী-কী একান্ত পরিবর্তন ঘটছে তার শরীরে, ছেলেটি তা জানত। হয়ত বলেও ফেলত যদি-না সেই মুহূর্তে সে নিজেই একটি কৌতূহলে আক্রান্ত হত। তার সাধ হচ্ছিল, মেয়েটিরও মনে, দেহ-লক্ষণে পরিবর্তন ঘটছে কিনা, সেই গূঢ় সমাচার চেটে পুটে জেনে নেয়।

জানা হল না। হাওয়া উঠেছিল, বড় বড় ঢেউ দিচ্ছিল। নৌকোয় টলমল মেয়েটি তখন নিজেই বলল, "এবার চল।"

"চল।"

পাড়ের কাছে লম্বা ঘাসের শিসে শিসে ফড়িং, নরম কাদায় ছোট ছোট গর্ত, আর টানা-টানা দাগ—কাঁকড়ার।

মেয়েটি এবারও আড়ষ্ট, কিন্তু তাকে নামিয়ে নিতে ছেলেটিকে হাত বাড়াতে হল না, কারণ আরও শক্ত দু'টি হাত এগিয়ে এসেছিল, ছেলেটি আর মেয়েটি দু'জনকেই টেনে নামিয়ে নিল।

ছেলেটি মুখ তুলে দেখল, হেড্ মাস্টার মশাই। মেয়েটি দেখল, তার বাবা।

কঠিন কণ্ঠ শোনা গেল, "উঠে এস।"

নৌকো বেঁধে রাখার দরকার নেই, কারণ মাঝিরা তার আগেই হেঁই-হেঁই করতে করতে নেমে এসেছে। নৌকো বেপাত্তা দেখে তারাই মাস্টার মশাইকে এত্তেলা দিয়ে থাকবে।

"এস।"

একটি বজ্রাদপি কঠোর ব্যক্তিত্ব, অভিভাবকসুলভ অধিকার এক কিশোর আর কিশোরীকে অমোঘ আদেশের রজ্জুতে বদ্ধ করে ডেকে নিয়ে গেল।

সেই সন্ধ্যায় মাস্টার মশায়ের কোয়ারটারের ভিতরের বারান্দাই হয়েছিল এজলাস। কাঠগড়ায় দাঁড়-করানো দু'জনের মুখের উপর টর্চের আলো এসে পড়েছিল। টর্চ তো নয়, তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টির দারুণতা। সেই আলোয়, টর্চের তলায়, আড়চোখে চেয়ে ছেলেটি দেখল, মিনি যেন ম্রিয়মাণ মৃৎপ্রদীপ।

কয়েক মুহূর্ত কোন জিজ্ঞাসাবাদ নেই। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। ঝোপে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। এই প্রশান্তিটাই তো ভয়ংকর।

রঞ্জনরশ্মি দৃষ্টি ছেলেটি সইতে পারল না, চোখ নামিয়ে নিল। দু'জোড়া খালি পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছে। নরম কাদায় টান ধরেছে, শুকিয়ে গিয়ে চিমটি কাটছে, আঙুলের ফাঁকে সেঁটে আছে—গুগলি আর কল্‌মি শাক। কাছাকাছি কোথাও জাগ্‌দেওয়া নতুন পাটের পচা-পচা গন্ধ।

"তোমরা দু'জনেই দোষী, প্রথমত পালানো, দ্বিতীয়ত নৌকো চুরি।" জলদকণ্ঠ ধ্বনিত হল, "কিন্তু একজনকে আমি ছেড়ে দিতে পারি। বলো, পরামর্শ কে দিয়েছিল, মতলব কার?"

"বলো, কার?" একটি কথাই কি আবর্তে পড়ে গিয়ে বারবার ফিরে আসছিল, নাকি বিচারকই পুনরাবৃত্তি করছিলেন একই কথার?

"তুমি তিমির, ভালো ছেলে, ক্লাসের ফার্স্ট বয়। আমার দৃঢ় ধারণা তুমি নিজে থেকে এ-কাজ করোনি। মিনিই তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তাই না?"

তাই না?—শব্দ দুটি সুরেলা হয়ে একটি বিভ্রম, একটি প্রলোভন, একটি দুর্বলতার সৃষ্টি করল, তাই কি হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লাগল ভালো ছেলেটির, ঘাড় আপনা থেকেই কাত হল একদিকে আর ডান হাতের একটি ভীরু আঙুল বিনাবাক্যে মেয়েটিকে দেখিয়ে দিল?

"যাও।"

ভীরু, ভালো ছেলেটি আর দাঁড়ায়নি। ছুটে গেট পার। তবু বাইরের রাস্তায় সে কি থমকে পড়েনি এক নিমেষ, সপাং, চাবুক পড়ার আওয়াজ, ঝিঁঝির ডাক, পায়ের তলায় শামুক, পচা পাটের উৎকট আবেশ, আকাশে তারা, গাছের পাতায় জমানো কান্না, কুৎকুতে কয়েকটি ঝুপঝাপ ব্যাঙ, আর বুকের ঠিক মধ্যিখানে একটি সাদা সাপলা ফুল। গেঞ্জির আঁশের সঙ্গে সাপটে আছে, ঝরে যায়নি।

সারা রাত ঘুমে তন্দ্রায় অথবা অনিদ্রায় সপাং সপাং চাবুক পড়ছিল বুকে পিঠে মুখে, লজ্জা, জ্বালা, যন্ত্রণা। স্বপ্নে অনেকগুলো কেঁচোকে কিলবিল করে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল। ওরা পায়া বেয়ে বেয়ে যত বিছানায় উঠে আসে, ছেলেটি তত সরে যায়। সব ক'টি কেঁচোর মুখ দেখা দিল এক সঙ্গে, আরও অসম্ভব কাণ্ড, মুখে ভাষাও ফুটল।

"সরে যাচ্ছ যে!"

"ঘেন্নায়।"

"ঘেন্না?"

"তোমরা পিছল, ক্লেদাক্ত। তা ছাড়া তোমাদের হাড় নেই।"

"হাড় তো তোমারও নেই। শিরদাঁড়ায় হাত দিয়ে দ্যাখো তো।"

জেগে উঠে সে সত্যিই হাত দিয়েছিল পিঠে, পরখ করেছিল। আমিও কি একটা কেঁচো, কণ্টকিত হয়ে ভাবছিল। শিরদাঁড়াটার খোঁজ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

'মিনির সঙ্গে দেখা করব। আমার যে হাড় আছে, জানাব। ক্ষমা চেয়ে বলব, দেখে নিও, আর হবে না।' এই সংকল্পটা গানের

সুরের মত মনে মনে ভাঁজছিল ক'দিন ধরে, কিন্তু সুযোগ পেল না একদিন শুনল মিনি নেই, মাসী না পিসীর বাড়ি চালান হয়ে গেছে।

সে ড্রিলের দলে নাম লেখাল, জিমন্যাসটিকসের চর্চা ধরল। ক্লাসে ভালো ছেলে তো ছিলই, বল সঞ্চয় করে দলপতিও হয়ে পড়ল।

সামনে অ্যানুয়েল পরীক্ষা, কিন্তু সে-ভাবনা মাথায় উঠতে বসেছিল আন্দোলনে। গোপনে পোস্টার লেখা, গাছে দেয়ালে রেলিঙে যেখানে পারে, লটকে দেওয়া। গরম গরম বক্তৃতা, উত্তেজনা।

যেদিন পরীক্ষা তার ঠিক আগের দিন স্টেশনে আর বাজারে প্রচণ্ড লাঠি চার্জ হয়ে গেল। তার পরেই বাছবিচার-বাদ ধরপাকড়।

সারা সন্ধ্যা জটলা করল ওরা। সে নিজে সবাইকে জড়ো করে বলল, "বয়কট। কাল পরীক্ষা দেব না আমরা।" তার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হচ্ছিল, শিরা স্ফীত, আবেগে কণ্ঠস্বর কাঁপছিল।

পরদিন স্কুলের গেটে শুয়ে রইল ক'জন, ওদের পাশ কাটিয়ে একজনও যেতে পারল না, কিংবা গেল না।

উন্মাদনায়, সাফল্যে কয়েকটি দিন এক ঝাঁক তীর হয়ে বেরিয়ে গেল।

তারপর অবসাদ, ক্লান্তি। একদিন সন্ধ্যাবেলা চুপ করে শুয়ে ছিল, সেকেণ্ড টীচার একজন ওদের বাড়ি এলেন। আলোয়ানের তলায় কোশ্চেন পেপার, স্কুলের ছাপমারা খাতা।

"তোমার জন্যে এনেছি। তখন পরীক্ষা দাওনি, এবার দাও। নিজেই বসে বসে লিখো, আমি নিয়ে যাব। তুমি সবচেয়ে ভাল ছেলে, তোমার ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে, তুমি নিশ্চয় বই দেখে লিখবে না।"

"আমি লিখবই না।" অপমানে মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে গেছে, সামলে নিয়ে সে থমথমে গলায় বলল।

"আমি বাড়ি বয়ে এসেছি, কেউ জানে না, আমার কথা রাখবে না?"

সে চুপ।

"তিমির, তোমার ওপর আমাদের অনেক আশা। আর সকলের যাই হোক, তুমি ফার্স্ট বয়, তোমার এক বছর নষ্ট হবে?"

সে তবু উত্তর দিচ্ছে না। সেকেণ্ড টীচার তখন শেষ কথাটারই পুনরুক্তি করে বললেন, "ভেবে ছ্যাখ তিমির—পুরো এ-ক-টি ব-ছ-র।"

তাঁর উচ্চারণের ধরনে কথাটা যেন সারা বছর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

সে অতঃপর কী বলেছিল মনে নেই। আপাতত কাটিয়ে তো দিই, এই অসহিষ্ণু চিন্তার বশে হয়ত বিরস স্বরে বলে থাকবে—"আচ্ছা, রেখে তো যান।"

তারপর, তারপর কী?

প্রশ্নপত্রগুলো সে কি কোনও অরোধ্য কৌতূহলে খুলে দেখেছিল? আর রাত জেগে খাতার পর খাতা যে ভরে ফেলল, সে কে, সে কি সে, সে কি আচ্ছন্ন প্রহরের পর প্রহরে, বিকারের ঘোরে?

মনে নেই। আবার কবে সেকেণ্ড টীচার এলেন, চুপি চুপি খাতাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন, তা-ও না।

কেননা, বাড়ি থেকে খানিক দূরে যেখানে বাঁশঝাড়টা নুয়ে পড়ে

নদীর জলপটে কী আছে পড়তে চাইছে, সেখানে বিকালের দিকে একা চুপ করে বসে থাকতে থাকতে একদিন তার চোখের পাতায় কী রকম জ্বালা ধরল, গলায় পিপাসা, মাথায় যন্ত্রণা। টলতে টলতে বাড়ি ফিরে টের পেল, জ্বর।

পর পর তিন দিন কোন জ্ঞান ছিল না। যেদিন জ্বর ছাড়ল, কিন্তু বিছানা ছাড়তে আরও অনেক দেরি, সেদিন ওরা এল একে একে, তার বন্ধুরা, মিছিলের মুখ একএকটি।

ওরা প্রত্যেকে একই কথা বলল, যেন আড়াল থেকে সড় করে মহলা দিয়ে এসেছে।

"সেরে উঠে স্কুলে যাস।"

"নোটিস বোরড দেখিস।"

"তোর নাম ঝুলছে।"

"তুই একা।"

"আমরা কেউ নই, তুই-তুই শুধু তুই।"

সবাই মিলে সমস্বরে যেন ছুয়ো দিচ্ছে ওকে। ওদের গলায় নালিশ নেই। গলায় ঝাঁঝা নেই, মুখেও কোন ভাঁজ না, অথচ খুব ঠাণ্ডা কৌতুক যেন ডেলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারছে।

ক্লান্ত, আহত সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল। আশ্চর্য, এই দেয়ালটাতেই যেন স্কুলের নোটিস বোরড, তার নাম, নীচে হেড মাস্টারের সই—

"প্রোমোটেড।" সে একা, প্রোমোটেড। আর কেউ নেই, সে একা ঝুলছে, লম্বমান, ও-পাড়ার মালো বউ সেবার পুকুরঘাট থেকে কার নোলকটা সরাতে গিয়ে ধরা পড়ে পরদিন স্বনির্বাচিত একটি আমগাছে দড়ি বেঁধে ঝুলছিল, মাথাটা ঝুঁকে আছে বুকের উপরে, জিভটা বাইরে আধ হাত, আমগাছের ডালে পিঁপড়ে, পিঁপড়ে

মালো বউয়ের রোগা, ফাটা শুকনো সিড়িঙ্গে পায়েও, ভোরে খুব ভিড় জমেছিল, আহা-আহা, শোনানো শোক, মর-মাগী ধিক্কার, লজ্জা।

সেই দৃশ্য। মালো মাগীর বদলে সে। নীচে তার বন্ধুরা। হাতে গুলতি, গুলতিতে নুড়ির বদলে টিটকিরি।

অথচ নোটিস বোরডে ঝুলছিল তো খালি তার নামটা। নাম কী করে শরীর হয়ে গেল, লটকে গেল দেয়ালে, তার ধারণাতীত।

ওদিকে পিঠের তলায়, কানের গোড়ায় প্রত্যাগত কেঁচোগুলোর গা-ঘিন-ঘিন স্পর্শে অস্থির সে অজ্ঞান হয়ে যাবার আগেই টের পেল, জ্বর আবার আসছে।

ট্রানসফার নিয়ে বড় শহরে যতদিন না পড়তে এল, ততদিন এই জ্বর ছিল।

[খ]

সেই শহর যেন এক জাদুকর, আজব এক কারিগর। ধীরে ধীরে তাকে ভেঙেচুরে দুমড়ে গড়ে-পিটে তৈরি করে দিল। স্কুলের পাট শেষ, কলেজে কয়েক মাস—নিভাঁজ মসৃণ একটা বনাত, কয়েকটা বছর।

সেখানে সবই যথাযথ, যার যেথা স্থানে ছিল। কাছারি, ক্লাব, কারখানা, কলেজ। মাতৃসদন, মন্দির, মজবুত গমবুজ, স্তম্ভ, কাৎ প্রাসাদ, মাটকোঠা ইত্যাদি। জলসত্র, জনারণ্য গাড়িঘোড়া, রথ। ধোঁয়া ধূলো, কালি, বরাদ্দ অনুযায়ী। তবু কিছু মাটি চৌকো করে কাটা মাঠ, ফালি ফালি করে কাটা চালকুমড়োর মত সাদা আকাশ। উজ্জীবিত তারুণ্যের মত গোচারিত ঘাস—এ-সবও ছিল। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, আড়তদার, পাইকার, জীবে দয়াময় দরাজ দাতা, পরতরেগতপ্রাণ লীডার। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট (রাস্তায় মেষ-বৃষ, শয্যায় মিথুন, কর্কট শয্যাতলে) রাশি রাশি। ঘরে ঘরে অনাঘ্রাতকুসুম কুমারী, আবার দলিত অথচ সাধ্বী রমণী, শর্তমত নিয়মিত প্রসূতি। পরিপূরক চিত্র হিসাবে, বাজারের পাশে, সনাক্তকরণ প্যারেডে সারবন্দী দাঁড় করানো ক্যাশ-ডাউন বেশ্যা।

যারা অভিজ্ঞা, রতি-অকাতরা। যেমন কলে চিমনির পাশাপাশি দৃশ্যপটে আরোপিত পুষ্পবৃক্ষ। প্রবল ডালে আলোড়িত শিমূল, নিঃশব্দ চিৎকারে রক্তাক্ত।

কর্কশ-কঠিন শহরটাও কি মাঝে মাঝে একটি আগ্নেয় ফুৎকারে চৌচির হতে চাইত না? হয়ত চাইত।

চৌচির হতও যদি না তাকে ঘিরে রক্ষয়িত্রী সেই নদীটি থাকত। ওই নদীটি জননী না প্রিয়া? শহর তার স্তন্যপায়ী শিশু, না অশ্লীল আশ্লেষে আবিষ্ট মোহবদ্ধ, মূঢ় একটি যুবা, উপাদেয় উরু বা অশালীন বাহুর বালিশে মাথা রেখে আলস্যে নিমজ্জিত?

দ্বিতীয়টাই সত্য বলে মনে হত। বস্তুত, ওই শহর-নদীর সহবাস থেকেই নব-নাগরিক যুবকটি পুরুষ ও রমণীর সম্পর্ক-রহস্যের কয়েকটি প্রাকৃত তত্ত্ব আহরণ করে।

পুরুষ ছিঁড়ে, ছেনে, ছিটকে স্বভাবী গতিতে বেরিয়ে যেতে চায়, নারী তাকে আঁকড়ে থাকে, আটকে রাখে। পৃথু মেদিনীর মাধ্যাকর্ষেরও যে-রহস্য।

কিন্তু ওই নদীই যখন ঋতুর নিয়মে খরস্রাবী, পরিপূর্ণা, সুখসমুৎসুক কামিনী, তখন সে-ই আবার শহরটার গায়ে ঝাঁপিয়ে নিজেকে ভাঙত। নখে-দাঁতে আঁচড়ে-কামড়ে স্থাবরকে অস্থির করে তুলত, তার আদিম, উদাম দেহদহে টেনে এনে ডুবিয়ে মারতে চাইত।

তবে এই দৃশ্যটা ছিল বছরে একটা বিশেষ কালে। নতুবা অন্য সময়ে ওদের সম্পর্ক একটুকু ছোঁয়া লাগানোর বেশী না। শহরও সচরাচর পোষমানা এবং পালিত। নদীর ঘেরই ঢের, তাকে ছাড়িয়ে ছড়িয়ে আর কোথায় বা যাবে!

অথচ কলকাতাকে ছ্যাখ। নদী তাকে সুড়সুড়ির ঘুষে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারেনি, বরং নদী নিজেই সমর্পিত। দুই পাশে দুই

বলিষ্ঠ থাবা, জানু আভঙ্গ, বীরবিক্রম মহানগর এই প্রথায় সহনশীলায় আরূঢ়, উপগত।

একবার কলকাতা ঘুরে এসে বলাৎকারের এই স্থির চিত্র সে মনে মনে বাঁধিয়ে রেখেছিল।

কৈশোর কাটিয়ে যৌবনের পৈঠায় পা। ফিরে তাকালে মনে হয়, ভীষণ গরমে, বন্ধ ঘরে ছটফট রাত কাটিয়ে নরম একটি সকালে পৌঁছে গেলাম।

কৈশোর গেল, তা নিয়ে আমার কোনও হা-হুতাশ ছিল না। কৈশোর কান্নার, কৈশোর কষ্টের, কৈশোর বড় কুৎসিত।

কুশ্রী-তায় কৈশোরের জুড়ি প্রৌঢ়ত্ব। কৈশোরে শৈশব যায়, কিন্তু যৌবন আসে না, ইচ্ছা গজায়, কিন্তু পূরণের উপকরণ মেলে না। প্রৌঢ়েরও কতকটা তাই, ইচ্ছা তখনও চড়চড়ে, কিন্তু সাধ্য নড়বড় করে। যৌবনের উদ্দামতা গেছে। কিন্তু বার্ধক্যের প্রশান্তি আসেনি।

কৈশোরে চোয়াল একবার ভাঙে, প্রৌঢ়ত্বে আবার। বার্ধক্য যদি দ্বিতীয় শৈশব, দ্বিতীয় কৈশোর প্রৌঢ়ত্ব। এক এবং অদ্বিতীয় যে, তার নাম যৌবন।

সেই যৌবনে উপনীত হয়ে মনে হয়, চরাচর তামার। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু আমি, আমি আছি, তাই এরা আছে এবম্প্রকার অহংকার।

যুবামাত্রেই প্রেরিত পুরুষ, প্রত্যেকেই ভাবে, কিছু একটা করব বলে ভবে এসেছি, সে-কাজ করে দিয়ে যাব।

গ্লানি আর মালিন্যের যত শ্যাওলা জমেছিল মনে, সব সেই দীপ্ত দিবালোকের রশ্মিবিদ্ধ সকালে ঝরে পড়ে গেল। নিষ্কলুষ নগ্ন ইস্পাতের মত ঝকঝকে চরিত্র নিয়ে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। সেদিন আর পিঠে হাত বুলিয়ে মেরুদণ্ড আছে কিনা খুঁজতে হয়নি। গিঁটওয়ালা বাঁশের মত সে আমার অস্তিত্বে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন তুমি কোথায় ছিলে, হে ঈশ্বর! তোমাকে আমি খুঁজিনি, চাইনি। তুমি তমসার পারে যদি জ্যোতির্ময়, আমি চরিতার্থ আপনা-আপনি, এই মর্ত্যে। বেপরোয়া দেনাদারের মত সব ঋণ অস্বীকার করেছি।

সেই নিরুপম সকালে সব যখন মেঘনীলিম, তখনও হৃদয় উৎখাত করে মাঝে মাঝে বজ্রপাত হত না, এমন নয়।

ঈশ্বর না থাকুন স্বাতী ছিল। এসেছিল।

আজ বুঝতে পারছি, আমাদের সত্তা কখনও নিরালম্ব থাকতে পারে না, তার একটা আশ্রয় চাই। ফাউনটেন পেনের যেমন চাই বুক পকেট, ভিজে জামা কাপড়ের চাই শুকোবার তার।

তবে কি স্বাতী নির্বিশেষ কোনও নীড়, বা নারী? তা-ও না। স্বাতী একটা শরীরও বটে। যে-শরীরে সব প্রত্যঙ্গের যথাযথ সংস্থান থাকে। ছোট মেজ জামায়, শাড়ির প্যাঁচালো প্রয়োগে নিজেকে অব্যর্থ সাজায়, ঢাকে। ছোঁয়া মাত্র যে-শরীর কখনও যেন-লজ্জাবতী, গুটিয়ে যায়, কখনও যাতে নির্লজ্জ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে।

দু'হাতে শাড়িটা ঘাঘরার মত ধরে স্বাতী নদীর বালুগর্ভ খাতে তরতর নেমে যেত, বিনুনিটা সপাং করে পিঠের উপরে আছড়ে আমাকে চোখ ইসারায় ডাক দিত "এস"।

উবু হয়ে নদীগর্ভে বসত স্বাতী, গালার বালাজোড়া কনুইয়ের কাছে গেঁথে দিয়ে নখ ডুবিয়ে খুঁড়ত আর খুঁড়ত।

"কী খুঁড়ছ, কী খুঁজছ স্বাতী?"

সে বলত, "এসোই না।"

বলতাম, "নদীর হৃদয় তো? কোনদিন খুঁজে পাবে না।"

সে না পাক, আমি পেতাম। আস্তে আস্তে চারদিক নিঃশব্দ হয়ে যেত, আমি এদিক-ওদিক চেয়ে ওকে বলতাম, "এই।"

"কী!"

"চুমু খেলে তোমার চোখ বুঁজে যায় কেন?"

"সব মেয়েরই যায়", সে বলত, তারপর চোখ খুলে, "কিন্তু সব ছেলে তোমার মত চুরুট খায় না।" আমি যেন ওর চোখের পাতায় এই সংলাপটা পড়তাম, "সরো, চুমু আর চুরুট একসঙ্গে হয় না।"

মনে পড়ছে সেই স্বাতীকে। যে নখ দিয়ে নদীর হৃদয় খোঁড়ে না। যে কলেজের ছাত্রী, কিন্তু পাড়ার দলের শখের অভিনেত্রী নয়, কথায় সড়গড়, তবু সংস্কারকে বাগানের আগাছার মত ছেঁটে ফেলতে পারেনি।

মেয়ে হয়ে স্বাতী এতটা সহজ হত কী করে? স্বাতী বলেছে, "মেয়ে হয়েও বেশি সংকোচ নেই কেন, জানতে চাইছ? দেখ, সংকোচ ছিল, ছেলেবেলায়। আমাদের থাকে। ছেলেদের তুলনায় কী যেন নেই, এই কুণ্ঠা। পরে ওটা আমরা কাটিয়ে উঠি। শাড়ি ধরি, নিজেকে আর-একটু লম্বা, সতেজ লাগে, শরীরে ভরি, তোমাদের

চেয়ে অনেক বেশী। কম বয়সের ক্ষোভ সেই অহংকারে সুদে-আসলে উপছে যায়।”

স্বাতীকে নিয়ে সেই কটা দিন সুখে-শান্তিতে কেটেছিল কি? তখন বুঝিনি, এখন বুঝি। সুখ হয়ত ছিল, শান্তি না। যেহেতু সুখ বস্তুত উষ্ণ পেয়ালার চুমুক, আর শান্তি ঠাণ্ডা জলে স্নান।

[গ]

আমি যা ভাবি তা লিখতে পারি না কেন। অন্তত যেভাবে ভাবি, কলমের মুখে সেই ভাবটা কিছুতেই ফোটে না, বলার কথাটাকে লিখিত কথা কেবলই ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিপথে নিয়ে যেতে চায়। যেটা অরণ্যে অযাচিত অপর্যাপ্ত হয়ে উঠতে পারত, সেটা কেয়ারি-করা সাজানো বাগানে দাঁড়ায়।

নইলে, পাতার পর পাতা ভরে গেল, কিন্তু একটি মিনমিনে বালক নির্বিবেক খুনে হয়ে গেল কিসে—এই প্রতিশ্রুত সোজা কথাটি লিখতে গিয়ে কথার গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেললাম কী-প্রকারে।

যেমন আর সব কথা মুলতুবি রেখে আপাতত একটি গন্ধরাজ ফুলের কথা লিখে রাখতে বাসনা হচ্ছে।

যখনই আমি একটি গন্ধরাজ ফুল পাই, নাকের কাছে ধরি, তখনই আমার মরনিং স্কুলের দিনগুলির কথা মনে পড়ে। অনুগ্র এই

শুভ্র পুষ্পটির সুবাসের সঙ্গে বাল্যকালের সেই সব সকালের অনুষঙ্গ আছে। খুব ভোরে ওঠা, চটপট তৈরি হয়ে যাওয়া, বগলে বইখাতা—আর, ফাউ, হাত বাড়িয়ে একটি-কি-দুটি গন্ধরাজ। মরনিং স্কুল চলত গ্রীষ্মকালে, তখন এই ফুলটাই বেশি ফুটত কিনা।

আজও ওই ফুলটির সান্নিধ্যে এলেই সম্মোহনী কোন যাদু অনুভব করি! পলকে মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে, যেখানে আছি, সেখানে থাকি না, একটা ভোজবাজী মন্ত্রবলে দৃশ্যপটটা মিথ্যা করে দেয়; উজান আরও উজান, যে-খেয়াঘাটে গিয়ে ঠেকি, সেখানে সব তকতকে, কাদা নেই।

একটি ফুল, গন্ধ তার একটুখানি বই তো নয়। গন্ধও এত মন্ত্র জানে!

ওই গন্ধরাজই কিন্তু একবার আমার জীবনে একটা সংকট ডেকে আনল। কুসুমে কীট—এই কাব্যপ্রসিদ্ধি মিথ্যা কে বলে।

রীতাকে তুমি যখন সহ্যই করতে পারতে না স্বাতি, তখন আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে কেন।

তুমি বললে, "জানো, রীতা তোমাকে দেখতে চেয়েছে।"

"রীতা কে?"

"আমার সম্পর্কে মাসতুতো বোন। ওরা সবে এই শহরে বদলি হয়ে এসেছে।"

"আমার কথা জানল কী করে?"

"আমার কাছে শুনে। জানো, ও আমার মত একটুও নয়,

খুব স্মার্ট, তুখোড় ইংরেজি বলে, স্কার্ট পরত সেদিন অবধি, হালে ছেড়েছে। টেনিসের কোর্টে ও খরগোসের চেয়েও তরতরে। দেখো বাপু, তুমি আমার মুখ ডুবিও না। খুব হুঁসিয়ার হয়ে ওজন করে কথা বলবে কিন্তু। ওকে বলেছি, তুমি স্টুডেন্ট ব্রিলিয়ান্ট।"

বললাম, "ভয় নেই। তোমার আশীর্বাদে দিব্যি তরে যাব, দেখো।"

রীতা এক দিন এল। তুমি বললে, "আমার বন্ধু", আমি দেখলাম তার ফাঁপানো চুল, ধূসর মণি, শরীর তটে "তিষ্ঠ" বলে থামিয়ে রাখা কয়েকটি ঢেউ।

তার মুখে "নমস্কার" শব্দটির দন্ত্য 'স'-এর উচ্চারণ ছিল তালব্য, তার কথার তোড়ে লহমারও ভাঁটা নেই, অনেক ঠাট্টা অনেক চাতুর্য এবং চাটুবাক্যে বিদ্ধ করে প্রথম দিন সে বিদায় নিল।

"কেমন দেখলে ?"

বুকে হাত চাপা দিয়ে বললাম, "আগে দম নিতে দাও। ঝড়ে বেড়া-টেড়া সব পড়ে গেছে, সেগুলো মেরামত করে খাড়া করে তুলি।"

ভ্রূভঙ্গে বললে, "তাই বুঝি! তোমার বেড়া এতই কমজোরী!"

চুল তোমারও ছিল স্বাতি, আরও দীঘল আর ঘন, কিন্তু তাতে ঢেউ ছিল না। তুমি তাদের কখনও সংবৃত করেছ, কখনও সারা পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে শ্রাবণের প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়েছ।

কিন্তু কী উগ্র তোমার ওই রীতা, যখন সে একটি দ্যুতির মত জ্বলত। যেন ছিমছাম একটি বেত, তার চলায় ফেরায় হাওয়ায় শাঁ-শাঁ আওয়াজ উঠত। তার ব্যক্তিত্ব ছিল—কড়া একরকম এসেন্স আছে না, ঢাললে রুমালে দাগ ধরে ?—সেই মত।

বললাম, "বড় বাচাল তোমার এই সখী।"

তুমি কাতর, আহত হয়ে বললে, "তুমি সেই সেকেলে, গেঁয়োই রয়ে গেলে। জানো, আমি তো স্টেজে দাঁড়িয়ে মুখস্থ পার্ট আওড়াতেও পারিনে,—রীতা অনেক কিছু পারে, নাচে, গান গায়, সেতার বাজায়।"

"আর গাছে চড়া, কুস্তি, এই সব?"

বললে, "অসভ্য", কিন্তু তোমার চোখ কৌতুকে নাচছিল।

তোমরা, মেয়েরা, স্বাতি যত সহজে ত্রস্ত হও, তত সহজেই আশ্বস্ত হতে পার।

রীতার কথায় পরেও ফেরা যাবে স্বাতি, কিন্তু একবার যদি খেই হারিয়ে ফেলি, তবে তোমার দয়া, তোমার মমতার কথা লেখা হবে না।

দ্যাখ, আমি তোমাদের বাড়িতে আশ্রিত একটি ছাত্র বই তো কিছু ছিলাম না। তখন যে-ব্যবস্থাটাকে "লজিং" বলা হত। নাম-মাত্র শর্ত, বাড়ির ছোট দুটি ছেলেকে ক্লাসের পড়া দেখিয়ে দিতে দিতে নিজে পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে হবে।

একতলার বসবার ঘরের পাশের ছোট ঘরখানা ছিল আমার। দেয়ালে একটা ক্যালেনডার, জামাকাপড় রাখার ব্র্যাকেট, পড়ার টেবিল, খানকতক বই-খাতা আর একটা তক্তপোষ।

কিন্তু আমার টেবিলে ফুলদানি আমদানি করল কে? কে কাগজপত্র, কলম ঠিক ঠিক ভাবে সাজিয়ে দিয়ে যেত, এমন-কী রাতে

শোবার সময় শিয়রে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল রাখতে কোন দিন কার ভুল হত না? অলিখিত আইন অনুসারে শাঁসালো উকিলবাবুর বাড়ির রান্নাঘরে যার আসনপিঁড়ি হয়ে খেতে বসার কথা, সে হঠাৎ একদিন ডাইনিং টেবিলে প্রোমোশন পেয়ে গেল কোন্ গুণে?

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা তুমি বলে কয়ে ঘুচিয়ে দিয়েছিলে স্বাতি, কিন্তু তোমার সেই দয়া তো সামান্য। আমি ক্ষমার কথাও বলব।

ওটা একটা বয়স, যখন পুরুষদের সমুখে হাজার দরজা খুলে যায়, অনেক রাস্তা তাদের টানে। একটা ঘরঘর শক্তি প্রচণ্ড বেগে বিদীর্ণ হতে চায়। ভাল মন্দ সবকিছু জানার, চাখার নেশা তাদের পেয়ে বসে। সবরকম অভিজ্ঞতা চাই-ই চাই, দেহ বল, আত্মা বল—এমন কোন পণ নেই, যা কবুল করে নব্য যুবক জুয়ায় বসতে না রাজি।

আমার যে-জানালায় রঙিন ছিটের পরদা টাঙিয়ে দিয়েছিলে তুমি, কোণের ঘরটিতে ছায়া-ছায়া আষাঢ় রচনা করেছিলে, তার বাইরেও আমার একটা জগৎ গড়ে উঠছিল।

কমনরুমে হৈ-চৈ, চায়ের কাপে সিগারেটের ছাই, খেলার মাঠে চিৎকার, বিনা টিকিটে রেলে এক্সকারসন, রেস্তোরাঁয় জমায়েত হয়ে কচকচ করে পলিটিক্স চিবানো, প্রাচীর-পত্রে ইস্তাহারের মুসাবিদা, গোপনে কাগজে লেখা পাঠানো—এই রকম পরস্পর সম্পর্কছুট অনেক খেয়ালে আর খেলায় সেই-আমার সময় ঠাকুরদার আমলের সিন্দুকের মত ঠাসা ছিল।

বন্ধুরা একদিন বলল, "প্রেম? প্রেম তো খুব চুটিয়ে করছিস,

কিন্তু প্রেম তো প্যানপেনে ব্যাপার। মদ খেতে পারবি? সাহস আছে?"

তখন সুপুরি চিবোলে মাথা ঘোরে, সিগারেটের ধোঁয়া মুখে টেনে নাক দিয়ে ছাড়তে ঝিম ধরে যায়, তার ওপর মদ? সংস্কার ছিল, প্রতিরোধ ছিল ভিতরের, সামলাতে পারব কিনা, সেই ভয়।

ওরা দন্ত্য উচ্চারণ দিয়ে বলল, "সি-সি", আমার কানে ঠেকল "ছি-ছি"। বললাম, "আলবত পারব।"

সেই নদীগর্ভে একটা বড়ো পাথরের আড়াল ছিল, তার পাশ দিয়ে তিরতির করে স্রোত বইছিল, আমরা উবু আর গোল হয়ে বসে ঢক্‌ঢক্‌ করে গিললাম।

একটু পরে বালি উড়ে উড়ে গেঁথে গেল চুলে, আস্তিন ফাঁসল কারুর কারুর, আর বুকের বোতামের বালাই তো একজনেরও ছিল না।

আমরা চুকচুক করে ফূর্তি চাখতে চাখতে আলাদা হয়ে যাচ্ছিলাম।

ওরা উঠে দাঁড়াল, একজন টলতে টলতে ঠেলা দিল আর একজনকে, সেও টলতে টলতে আর একজনকে নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

আমরা তখন তো আর সামাজিক আইন অমান্যকারী যুবক নই, এক-একটি তাস। তাসে-তৈরি বাড়ির মত ধুস ধুস করে পড়ে যাচ্ছি।

ওরই মধ্যে যে স্টেডি ছিল, সে খাড়া হয়ে উঠে আমার পিঠ চাপড়ে দিল।

"যা, তোকে তৈরি করে দিলুম। এবার সটান তোর স্বাতীর কাছে যাবি, ছাতি ফুলিয়ে বলবি, আমি মদ খেয়ে এসেছি, এ-এ-বার স্বাতি, তোমায় খা-ব।"

শেষাংশে সে রামপ্রসাদী সুর জুড়ে দিয়ে হেসে উঠল।

"আর শোন্, খবরদার, কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করে বলবি না, যা বলবি, বাঘের গলায় ডাক ছেড়ে বলবি।"

সত্যি কথা বলতে কী, সেদিন সটান যেতে পারিনি। ওদের হাত ছাড়িয়ে অনেক পরে আস্তে আস্তে গেট খুলে ঢুকেছি তোমাদের বাগানে, একটা গাছতলায় আড়াল খুঁজে হাঁটুতে মাথা গুঁজে আমার নেশা, আমার অন্যায়, আমার সাহস, আমার ভীরুতা—সব ধাতস্থ করতে চেষ্টা করেছি।

তোমাদের বাড়িটা নিস্তব্ধ। সকলে নিমন্ত্রণ রাখতে গেছে, যাবে, জানতাম। শুধু তোমার জানালায় একটি নির্নিমেষ আলো জ্বলছিল। তোমাদের বসবার ঘরের রেডিওটা চাপা গলায় গুনগুন করে সন্ধ্যাটাকে তুক করার তালে ছিল।

একটু পরে আলো জ্বলল আমার ঘরে, পরদায় তোমার ছায়া পড়ল। আমার ছায়াটাকে নিয়ে আমি তখন দূরে সরে যেতে চাইছি।

অতক্ষণ ধরে তুমি ওঘরে কী খুঁজছিলে স্বাতি? বইটই গোছালে, টেবিলে-চাপা দেওয়া কাগজটা তুলে দেখলে? যে-ঘরে আমি নেই, সেই ঘরে কি আমার ব্যবহৃত টুকিটাকি নাড়াচাড়া করে আমাকে পেতে চাইলে?

একটু পরে, অধীর পায়ে হয়ত এসেছ বারান্দায়, তারারা খুব চুপে চুপে সুন্দর করে তাদের রূপবৃষ্টি করছিল, অন্য দিন তোমার

পায়ে নরম চটি থাকে, সেদিন ছিল না, থাকলে তোমার বাইরে এসে দাঁড়ানো আমি টের পেতাম।

তবু এড়াতে পারলাম না তো। যেখানে তুমি আমাকে খুঁজে পেলে, বাগানের সেই কোণে রাস্তার লাইট পোসটের আড়-চাহনি এসে পড়েছিল।

আমার চুল এলোমেলো, চোখ তখনও ঘোলাটে কিনা আমি তো জানি না।

চেয়েই তুমি বুঝলে, কী বুঝলে, সে তুমি জান। আমার কপালে ঘাম আঁটা-আঁটা, হাতের তালুতেও ঘাম ছিল।

ইতস্তত করেছ তুমি, নিমেষ মাত্র, একটি আঁচল মমতার মত আমার সব গ্লানিবোধ মুছে নিচ্ছে, অনুভব করেছি।

স্থির, স্নিগ্ধ গলায় তুমি বলেছ, "এস।"

বশীকৃত একটি জীব তোমার পিছে পিছে গিয়ে যখন নিজের বিছানা চিনে ধপাস করে বসে পড়েছে, তখন অনুশোচনা থেকে সে নিজেই বিকৃত গলায় ডেকে উঠেছে, "জানো, আমি মদ খেয়েছি?" (বাঘের মত গলায় বললাম, না ইঁদুরের মত কিচকিচ করে?)।

"জানি।"

বাস, ফুরিয়ে গেল স্বীকারোক্তি, বুক থেকে তলপেট হালকা হল। বিছানার দিকে তৃষিত নয়নে চেয়ে বলেছি, "আমি শোব।"

"শোও।"

হাত বাড়িয়ে তোমাকে, তোমার আঁচলের খুট ধরতে গিয়েছি। "তুমিও থাক।"

"থাকব।"

বেসুরো গলায় গেয়ে উঠলাম, "চরণ ধরিতে দিও গো আমারে"— তুমি ডান হাতে নিষেধ তুলে বললে, "ছি"।

ও-গান তখন সেখানে মানায় না। বলেছ, "ওঠ।"

বিহ্বল চোখেই দেখলাম, চাদরটা টান-টান করে পাতা হল, তুমি ধুলো ঝাড়লে, তারপর চোখে চোখ রেখে বললে, "খোল।"

"কী?"

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে জামাটা। ছেঁড়া, ভিজে, ছোপ-ছোপ দাগ, রক্তের ছিটে।

তখনও ঘোর কাটেনি চোখে, এগিয়ে এসে নিজেই খুলে দিয়ে বললে, "লজ্জা কী। যাও, ওদিকে গিয়ে এবার কাপড়টাও বদলে এস। কাদা-মাখামাখি এটায় আর কিছু নেই।"

অপ্রস্তুত এই জীবটির বস্তুত তখন আর লজ্জা বলে কিছু ছিল না স্বাতি। বিভোর মুহূর্তে সব সমর্পণ করেছিলাম।

ঘর ছেড়ে যেতে ফিরে চেয়ে বললাম, "তুমি চলে যাবে না তো?"

"যাব না। এখানেই আছি।"

ফিরে এসে:

"ভীষণ মাথা ধরেছে।"

"শোও। হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।"

হাত তো নয়, জলপটি। ভালবাসার মেয়েটির হাত কি স্নেহময়ী মায়ের মত হয়ে যায়?

মুখ নীচু করে তুমি বলছিলে, "তুমি আর বাজে কিছু খাবে না, বল। আমাকে ছুঁয়ে বল?"

ছুঁতে হল না, কারণ ছোঁয়া তো ছিলই।

"খাব না।"

"অনেক কাজ করতে হবে যে তোমাকে, অনেক, অনেক বড় হতে হবে। কথা দাও।"

"পারব কি? আমি যে নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। জ্বলে, পুড়ে, ফেটে, ছড়িয়ে চৌচির হয়ে যাই।"

কানের কাছে মুখ এনে বললে, "লেখো না কেন?"

লেখা? কোনদিন আমি কিছু লিখতাম কি? জড়িত গলায় বললাম, "পড়ার বইয়ের একটা লাইন মনে পড়ছে স্বাতি।···দ্যাট ওয়ান ট্যালেনট হুইচ ইজ ডেথ টু হাইড, লজ্‌ড উইথ মি ইউজলেস।"

ঐশী যে-শক্তিকে অপব্যবহারে অকারণ করে রাখা মৃত্যুতুল্য, তার নাম লেখা।

জুড়িয়ে যেতে যেতে বললাম, "বড্ড ঘুম পেয়েছে।"

তখনই বুঝি হলঘরে আলো জ্বলে উঠল, জুতো, গল্প, অনেক গলা, খসখস, তুমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "বর্গী এল দেশে। তুমি ঘুমোও, আমি যাই।"

[ঘ]

এই শীতকালের শেষবেলায়, যখন বারান্দায় চেয়ার টেনে বসি, আমাকে ঘিরে অনেক পাখি ডাকে, অনেক শুকনো পাতা বাঁধানো শানের উপর দিয়ে ছড় টেনে যায়।

মনে হয়, যেন কোনও চড়ায় আটকে আছি। কারা নামিয়ে দিয়ে গেছে আমাকে।

আকাশে দিনের বিলীন যৌবন, সামনে আদিগন্ত জল, পিছনে বিস্তারিত কোনও বিমূর্ত কাহিনীর মত ক্ষেত, খাঁজ নেই, ভাঁজ নেই, ফসল এক কণাও না। সব খড়খড়ে, শুকনো। আমার গালে মাছি বসে, তাড়াতে হাতের পিঠ ঘষি। ওই কাটা-ফাটা নিরঙ্কুর মাঠের সঙ্গে আমার কড়া খোঁচখোঁচ দাড়িতে ছেয়ে-যাওয়া গালের মিল আছে।

সামনের জল লোনা, কিন্তু পিছনে গুল্ম-সমাচ্ছন্ন আধো-অন্ধকারে একটি ঝিল নিশ্চয় কোথাও প্রচ্ছন্ন। তাতে জল আছে কি? জানি না। এই শীতে জল থাকে না, পাতালের উদ্‌বৃত্ত উৎসার আবার পাতালে ফিরে যায়।

থাকে না পদ্মও। শুধু কালো ছিট-ধরা পাতাগুলো শুকনো-শিটোনো হয়ে থাকে।

দেখতে দেখতে বেলা টুপ করে ডুবে যায়, আমি দেখি। এই ম্রিয়মাণ অবসানের সঙ্গে আমার মিল খুঁজি।

হঠাৎ তখন যদি হাওয়া দেয়, দলে দলে বালকের মত রাশি রাশি প্রগল্‌ভ পাতা উড়ে এসে আমাকে ছেয়ে ফেললে, তখনও উচাটন হই না। প্রৌঢ় চাদরটা আরও সমাদরে গায়ে জড়িয়ে নিই।

যদি চমকাই, তবে চেয়ারের গায়ে ঠেকিয়ে-রাখা লাঠিটা ঠকাস করে পড়ে। আমার শেষ বয়সের নড়ি।

শেষ পারানির কড়ি কী?—গান? আমার কণ্ঠে নেই। আজ আছে শুধু ক্রিসটালের মতো কঠিন হয়ে-যাওয়া ভাবনার কয়েকটি নুড়ি। তারা চকমকি নয়, জ্বলে ওঠে না, নাড়াচাড়া করলে কেমন অদ্ভুত কড়কড় ছাড়া কোনও আওয়াজ বের হয় না।

অনেক দূরে একটা পলাশ গাছ তার ন্যাড়া, নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর রক্তাক্ত ব্যক্তিত্ব পলকে আমার প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়ায়।

আর তখনই, স্বাতি, মনে পড়ে তোমাকে। লোকারণ্যেও নির্জন একটি শুভকামনা, একটি ভালবাসা, একটি ঈর্ষাকে।

সেই প্রগাঢ় সন্ধ্যার নরম মমতার দাম কি আমি রেখেছিলাম?

রাখলে রীতা এত ঘন ঘন আসত কেন। ওর সাবজেকট আমি ভাল বুঝি, এই ছুতোয় এসে বসত। পড়ায়-পড়ানোয়, খেলায়-খেলায় যতক্ষণ কেটে গেছে ততক্ষণ তুমি দূরে দূরে থেকেছ। তোমার বিষয় আমাদের নয়, আমাদের তর্কজালে কোন উৎসাহ পেতে না, কখনও কাছে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়েছ, কখনও সরে গেছ।

দোষীর মত বলেছি, "তোমার ভাল লাগছে না। আজ পড়া থাক, এস বরং তাস খেলি।"

"তাস খেলতে আমি জানি না।"

উঠে গেছ।

সোৎসাহে বলে উঠেছে রীতা, "তাস খেলবেন, সত্যি ? আমাদের ওখানে আসুন না। ওখানে খুব জমবে, মা আছে। তিনজনে মিলে কাট থ্রোট্।"

হাসতে হাসতে বলেছি, "কাট্ থ্রোট ভাল লাগে না। আমার পার্টনার চাই।"

সুর্মাটানা চোখ ঝিলিক দিয়ে হেসেছে, বিনুনির সাপ উঠেছে হিসহিস করে।—"পার্টনার ? তা-ও পাবেন।"

একটি সিঁদুরের টিপ তোমার কপালে সূর্যের মত জ্বলছিল।

তাড়াতাড়ি তাসের প্যাকেট বের করে বলেছি, "এস, একটা ম্যাজিক দেখাই তোমাকে। এই তাসটা ধর। কী তাস বল তো ?"

"তাস চিনি না।"

"কী রঙ, তা বলতে পারবে তো ?"

"রঙও চিনি না।"

"তা হলে আর কী।"

অভিমান নকল করে বলতে গেছি, "তুমি আমার কথা রাখলে না।"

আস্তে আস্তে রীতা আসাই বন্ধ করে দিল। আস্তে আস্তে আবার ফুটে উঠছিলে তুমি। পাপড়িগুলি মেলছিল। বালিশ তুলে একদিন দুটো রুমাল পেলাম, ভাঁজ করা, পরিপাটি।

আলাদা দেখা হতেই বললাম, "পেয়েছি।"

ইচ্ছে-করে না-বোঝার ভাব করে বললে, "কী ?"

"রুমাল।"

চোখ দুটিকে আয়ত করে বলেছ, "আর কিছু পাওনি ?"

"আবার কী ?"

"রুমালে গন্ধও ঢেলে দিয়েছিলাম যে।"

"বোধহয় উঠে গেছে" বলতে যাচ্ছিলাম, শুধরে নিয়ে বললাম "না, না, গন্ধ তো আছে। এই তো পাচ্ছি।"

তোমার গুচ্ছ গুচ্ছ চুলের এক মুঠো ধরে নাকে ধরেছিলাম কিনা।

একটি নির্বাধ, নিরস্থি কয়েকটি পেশিতে পরিণত হয়ে গেছ তুমি। নিরালায় কয়েকটি নিরর্থক শব্দ ধ্বনিত হতে শুনলাম।

—"এই।"

—"বল।"

"তোমার সাবজেক্ট আমারও হল না কেন।"

"ভুলে যাও।"

"এই! আমাকে তাস খেলা শিখিয়ে নেবে ?"

উত্তর দেবার মানে হয় না।

"কথা বলছ না যে।"

"তবে তো আমাকেও রুমাল তৈরী করা শিখে নিতে হয়।"

"ঠাট্টা! কিন্তু ছাখো, ছুটো জিনিস এক নয়।"

"নয় কেন ?"

নতমুখে বলেছ, "নয় এই কারণে যে, রুমালে নক্‌শা বুনি আমি একলা!"

বুনতে বুনতে তাই বুঝি ছুঁচের একটু খোঁচা দিলে।

রুমাল ফিরিয়ে দাও—সে কি, রুমাল দিতে নেই, লোকে বলে

রুমাল দিলে ছাড়াছাড়ি হয়, ভুলে যায়—রেখে দাও ও-সব কথা, লোকে কতই তো কী বলে, আমি এখানে আর ক'মাস আছি বল তো—ছ'মাস সাত দিন—গুণে রেখেছ দেখছি—তারপর তুমি কোথায় যাবে, অনেক বড় হবে, স্কলার আরও কত কী, আচ্ছা তখন লিখবে তো—লেখা তো আমার কাজ—সে-লেখা না, আমাকে চিঠি।

অনেক কথা ছোট বড় বুদ্বুদ, বলয় বৃত্ত তৈরি করতে করতে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

"চিঠি যদি কারও হাতে পড়ে। ধর, তোমার বাবার।"

"বাবাকেও তো লিখবে তুমি। সব কথা। তখন তো তুমি পরীক্ষায় পাস করেছ, কত যশ, লিখতে লজ্জা কী। শেষে এসে আমাকে নিয়ে যাবে।"

"বর আসবে এখুনি, নিয়ে যাবে তখুনি—সেই ছড়ার মত ?"

"আমি যা ঠিক করেছি, ভেবে রেখেছি, সেই মত।"

এত নির্ভরতা, পরিপূর্ণ বিশ্বাস, তবু ফুল নিয়ে সেই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটে গেল।

রীতাদের ওখানে যেতাম, তুমি জানতে না। বাড়িতে থাকার সময় কমিয়ে দিয়েছিলাম, তুমি জানতে অধ্যাপকের বাসায় ক'জন ছেলে মিলে পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে যাই।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি যখন, তোমার ঘরের আলো জ্বলে। যেই ফটক খুলি আলোটা হঠাৎ নিবে যায়। সেই সঙ্কেতের মানে আমি এখন পড়তে পারি। "আমি ছিলাম, জেগে ছিলাম; এই আমি এখুনি তোমার মধ্যে এই অন্ধকারে ডুবে গেলাম।"

তোমার সন্দেহ কবে হল স্বাতি? আমার গায়ে কি কোন গন্ধ থাকত, যা ধরিয়ে দেয়, অথবা চোখের মণিতে কোনও অন্যমনস্কতা, অপরাধবোধ? অথবা কোনও চিহ্ন চাই না—মেয়েরা এমনিতেই অনুমানে সব বুঝে নেয়?

একদিন ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, দরজা আগলে তুমি দাঁড়ালে।

"কোথায় ছিলে বলে যাও।"

"জানো তো প্রফেসরের বাড়ি। ভীষণ টায়ার্ড, পথ দাও।"

"মিথ্যেবাদী। সেখানে যাওনি।"

তখনও একটু আগে পিছনে রেখে-আসা মাদক হাসির ফেনা কানে প্রাণে মাখামাখি হয়ে ছিল, ধূসর দুটি চোখ যেন ধাওয়া করে এ-বাড়ি অবধি এসেছে, তার আগে কত লুটোপুটি, তখনও রগে রক্ত নাচছে, ফস করে তাই কটু একটা কথা বেরিয়ে গেল—"তুমি কি গোয়েন্দা, শুঁকে শুঁকে খোঁজ নিতে গিয়েছিলে?"

মৃত্যুবাণের মত কথাটা তোমাকে বিঁধতে পারত, কিন্তু স্বাতি, তুমি বর্ম পরে তৈরি হয়েই এসেছিলে।

ছাই হয়ে যাওয়া মুখে কঠিন হাসি ফুটিয়ে বললে, "তোমার মত মিথ্যেবাদী হলে বলতাম তাই। কিন্তু সেই প্রফেসর নিজেই যে এসেছিলেন। তুমি যাওনি, তাই নোট রেখে গেছেন। এই নাও।"

কাটিয়ে-ওঠা তোতলামিটা আমাকে সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করল।

—"তা-তা তো নয়, যখন যাই, উনি বাড়ি ছিলেন না। বন্ধুদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে—"

তেতো গলায় বলেছ, "কেন, এ-বাড়িতে কি খেতে পাও না।"

"তুমি বুঝছ না। বাড়িতেই খাই তাই বলে রেস্টুরেন্টে খাব না?"

"বুঝেছি বলেই তো বলছি। বাড়িতে খেয়েও বাইরে খেতে সাধ তোমাদের জাতের ধাত।" (কী ইতর হয়ে তুমি কথা বলতে পার স্বাতি, এতদিন এই নখ দাঁত ঢাকা দিয়ে রেখেছিলে কী করে)।

তখনও তুমি থামনি, বলে গেছ, "কিন্তু বাইরে যারা খেতে যায়, তারা নিজের বাড়ি থাকে, পরের বাসায় থেকে ও-সব শখ সাজে না।"

তখন ছাই হবার পালা আমার। তবু বলেছি, "শুধু শুধু থাকি না। নিজে পড়ি, ছেলে পড়াই, তবে খাই।"

"আর সেই বাড়ির কুমারী মেয়েকে মজাও।"

তখন হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে, বলেছি, "বিশেষ করে সেই মেয়ের, যার বুকে দুরারোগ্য ব্যামো, বিয়ে হবে না। তার সঙ্গে প্রেম, জানি না, সেটাও এই লজিং টুইশনের শর্ত কিনা। আমার আগে যারা ছিল, তারা হয়ত বলতে পারবে।"

সেই মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যেতে পারত। তুমি অন্ধ হয়ে যেতে পারতে। হাতের কাছে যা-হোক একটা কিছু পেয়ে ছুঁড়ে মারতেও বাধা ছিল না।

কিন্তু করুণাময়ি, তুমি পা থেকে মাথা অবধি শিউরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে কেন, আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, দেখলাম পিঠের মধ্য ভাগ উথলে উঠছে, আর কামুক পশু আমি, স্খলিত আঁচলের অবকাশে তোমার শরীরের যে-যে অংশ প্রকটিত হয়ে পড়েছিল, লোলুপ চাহনি দিয়ে তা চাটতে শুরু করে দিয়েছিলাম। (সেই মুহূর্তেই জানলাম স্বাতি, আমি যদি কোন দিন শব-ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তার হই, তা হলে লাশকাটা ঘরে মৃতা রোগিণীরও আমার কামনার কাছে রেহাই নেই।)

আমি হাঁটু ভেঙে তোমার পিঠের কাছে বসেছি, ফাঁস খুলে দিয়েছি তোমার বিনুনির, গ্রীবামূলে হাত রেখেছি সন্তর্পণে।

আস্তে আস্তে বলেছি, "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। সেদিন আমার মদ খাওয়ার পাপ ক্ষমা করতে পেরেছিলে, আজ সামান্য এই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারবে না ?"

আশ্চর্য তোমার মনের জোর স্বাতি, বিছানার চাদরটা মুঠি করে ধরে ধীরে সোজা হয়ে বসলে। শরীরটাকে আগাগোড়া ঢেকেছ, এমন কী পায়ের পাতা দুটিতেও একটুকুও ফাঁক রাখনি। কেবল তোমার বুক তখনও ওঠা-পড়া করছিল।

খুব স্তিমিত সংযত গলায় বলেছ, "সামান্য ব্যাপার তো নয়।"

বললাম, "সেদিন মাতাল জেনেও—"

হাসলে।—"সেদিনের মাতাল সেই মুহূর্তে অন্তত মিথ্যে কথা বলেনি। আজ মদ খায়নি বলেই বলছে। আমি যে জানি, সে আজ রেস্তোরাঁতেও যায়নি।"

রুদ্ধশ্বাসে বলেছি, "সে তবে গিয়েছিল কোথায় ?"

"সে-ই জানে।" ঝড় থেমে যাওয়ার পর যে হাওয়া বয়, তোমার গলায় তখন সেই হাওয়া বইছে।—"আমার জানার দরকার নেই। আর দরকার হবে না। শেষ হয়ে গেছে।"

মাথা নোয়াতে গিয়ে তখন দেখতে পেলাম, আমার বুকে গন্ধরাজ ফুল। এত ঝড়েও খসে পড়েনি, আশ্চর্য, বোতামটার সঙ্গে গেঁথে আছে।

খুলে নিলাম। কী সাহস, হাত বাড়িয়ে পরিয়ে দিতে গেলাম তোমার চুলে। মাঝ পথে কেড়ে নিয়ে তুমি বললে, "কার ফুল ?"

"পেয়েছিলাম। তুমি নেবে ?"

"নিলাম। এটা এখন আমার হল তো ?"

আস্তে আস্তে তুমি দুটো আঙুলের মধ্যে চেপে চেপে ফুলটাকে

চটকাতে থাকলে। থেঁতলে যেতে থাকল পাপড়ির পর পাপড়ি। যেগুলো গেল না, তুমি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

ভাবলেশহীন মুখ, কণ্ঠে করাল একটি আদেশ—"এবার যা-ও।"

সে-আদেশের বিরুদ্ধে, লম্পট একটি মূর্খও বুঝতে পেরেছে, আপিল চলে না।

ছোটলোক কোন মিথ্যুক সেদিন চোরের মত বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। শেষ রাত, হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, শতরঞ্চিতে জড়ানো বালিশ, তার পার্থিব সম্বল।

সোজা বাস-স্ট্যাণ্ড। ড্রাইভারের মেট ঝুঁকে পড়ে চাকার নাড়ি টিপে দেখছে, উটের মত উদ্‌গ্রীব বাসটা গলকম্বলে বালতি বালতি জল ভরে নিয়ে যাত্রার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ড্রাইভার রেস করিয়ে দেখে নিচ্ছে, বাহনটির হৃদযন্ত্র অবিকল কিনা, চারপাশ ত্রাহি-ত্রাহি ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। ভিতরের আসনে যে কজন যাত্রী তারা সকালের হিমেল হাওয়া ঠেকাতে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে বসেছিল। কয়েকটি পুঁটুলি যেন—মানুষ না মানুষের ভঙ্গিসর্বস্ব ভূতুড়ে কয়েকটি প্রাণী, অস্পষ্ট আলোয় বোঝা যায় না।

ড্রাইভারের সাকরেদ ছোকরা অবশেষে শিস দিয়ে উঠল রেল-গারডের শিটির নকল করে, হাতের কাছে-পিঠে থাকলে সে হয়ত সবুজ একটা লণ্ঠনও দিত দুলিয়ে। নেই, ছোকরাটি তাই বাসটার দাব্‌নায় কয়েকটা পরাক্রান্ত চাপড় মারল।

সীটে-বসা মানবিক আকৃতিযুক্ত পদার্থগুলি ততক্ষণ সোজা হয়ে

বসেছিল, মাথার মুড়ি সরিয়ে কুতকুতে নজর এদিক ওদিক চালান দিচ্ছিল কেউ কেউ, পাশের চায়ের দোকান থেকে শেষ মুহূর্তে ভাঁড় ফেলে দিয়ে হ্যানডেল ধরে দুর্গা বলে ঝুলে পড়ল একজন, সাকরেদ ছোকরা হাত বাড়িয়ে তাকে আত্মসাৎ করবে বলে সাপটে ধরল। স্টার্ট-নেওয়া বাসের বিকট ধমকে আর ঝাঁকুনিতে মৃদু গুঞ্জন যা উঠেছিল, চাপা পড়ে গেল।

সোজা রাস্তা ধরে একটানা দৌড়ে নড়বড়ে সাঁকোটার মুখে এসে যখন দম নিতে দাঁড়াল বাস, ঠিক তখনই একটা লালচে মদের পিপে যেন ফেটে পড়ল পুব-আকাশে। কয়েকটা প্রলুব্ধ কাক ব্যস্ত-সমস্ত হাঁকডাক তুলে ছুটল সেদিকে, খালি শিরীষ গাছটার আড়ালে অলস কোকিলটির কোন তাড়া ছিল না, উত্তাল আলোর কলরবের সঙ্গে সে খুব মিষ্টি করে সুর মিলিয়েছিল।

বাসটা যখন থরথর সাঁকোর উপরে, তখন সেই পরিপ্লুত পরিবেশে একটি পলাতক যুবকের প্রলাপ পলকে প্রার্থনায় রূপান্তরিত হয়ে গেল ঃ আমার প্রদত্ত অঙ্গীকার আমি কিছুতে রাখতে পারছি না, হে ঈশ্বর, আমাকে তুমি স্থির করে দাও। লোভ আর দুর্বলতা আমাকে অধিকার করে, আমাকে প্রহার করে প্রতারণা আর মিথ্যাচার। সততার ন্যূনতম শর্তগুলি যদি পালন না করি, তবে বরং শেষ হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। এর কাছে পাওয়া গন্ধরাজ ফুল ওর চুলে পরিয়ে দিতে এগিয়ে যাই, সেই হঠকারী শঠতার শাস্তি কী?

[৬]

কোন-কোন মেয়ে পালের মত, কোন কোন মেয়ে কাছি। কাছি রাখে পাড়ের কাছাকাছি, ছিঁড়লে শুরু হয় পালের পালা, হাওয়ার টানে সে দ'য়ের আবর্তে টেনে নিয়ে যায়।

ডান হাতে স্টিয়ারিং বাঁ-হাতের কনুই দিয়ে আমাকে খোঁচা মেরে রীতা বলল, "ফিলজফার, কী ভাবছ?"

"এই রাস্তা কোথায় গেছে।"

"রাস্তা তো যায় না, থাকে। শুধু আমরা যাই।" বলেই রীতা হেসে খিলখিল হল,—"দেখলে, আমি তোমার মত সাজানো কথা বলতে পারি।"

"পার।"

"পারি না, শিখছি। সঙ্গদোষে কিংবা গুণে। বিজ্ঞানে ভাল কনডাকটার বলে একটা কথা আছে না? আমি তাই। কিন্তু ছাখ, মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার কথাগুলো শুধুই সুন্দর, সাজানো। প্রাণ নেই।"

"সাজানো প্রায় কোন জিনিসেরই প্রাণ থাকে না।"

বাঁ চোখে কটাক্ষ হানল রীতা, সেই রীতাই আবার বলল,

"আমাকে কটাক্ষ করছ? কর। কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি য়ু আর আটারলি রং দেয়ার। আমার প্রাণ আছে, সে প্রাণ অন্য প্রাণে সঞ্চারিতও করে দিতে পারি। পিটি, য়ু আর নট এ গুড কনডাকটর। কী, কথা বলছ না যে!"

"পরে বলব। আগে তুমি আর কী কী পার, তার তালিকাটা সম্পূর্ণ কর।"

আবার কনুইয়ে ধাক্কা দিয়ে রীতা বলল, "ফ্রিজিড্ ম্যান, কোল্ড মাট্ন। সেক্স মার্কা দু'-একটা পেপারব্যাক উলটে দেখেছিলাম, কোন কোন মেয়ে নাকি ফ্রিজিড্, ছেলেরাও ফ্রিজিড হয় জানা ছিল না।"

"ভাল করে পড়লে জানতে ছেলেরা তার চেয়েও অপারগ হতে পারে।"

কুটিল ঠাট্টার হুল ফুটিয়ে রীতা বলল, "আমি জানি তুমি কী বলতে চাইছ। কিন্তু তুমি তো তা নও। ওটা তোমার একটা পোজ, চালাকি। তা আমি একেবারে যে ফেল করেছি, তা নয়। এই তো ক' মাস আগে তুমি এসেছিলে, জবুথবু চাবুক-খাওয়া একটা জীব। কলকাতায় তোমাকে এসে ধরলাম, ভাগ্যিস বাবা আবার ট্রান্সফার হল। রাস্তার মোড়ে বুলেটিন বেচছিলে, তোমাকে আমি দেখতে পেলাম কিন্তু ঠিক। ক্রেডিট দেবে না?"

"কপিরাইটই তো দিয়ে রেখেছি। সর্বস্বত্বের দাসখত।"

রীতা বলল, "আবার সেই সাজানো কথা! আচ্ছা, স্বাতীকেও কি তুমি ওই নকল বুলিগুলো ঝাড়তে? নো ও'নডার শী উড হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ য়ু।"

"রীতা, স্বাতীর কথা থাক।"

রীতা ঠোঁট কামড়ে গাড়ির স্পীড কমিয়ে নিল। ইংরাজীতে

মামুলি যা বলল, বাংলায় আক্ষরিক তর্জমায় তা আরও অর্থহীন—"আমি দেখছি।"

হাই তুলে বলল, "বুঝলুম, তোমাদের বাংলা গানের মেঘের ছায়ায়, অন্ধকারে, রেখেছি ঢেকে তারে—সেই ব্যাপার, না? কী দেখছ।"

"দেখছি তুমিও জেলাস্ হতে পার।"

"ননসেন্স। আমার বুকের ভিতরকার হার্ট, লাংস তবে একেবারে কৃত্রিম নয়, কেমন? পাল্সও ঠিকমত চলে। আর বুকের বাইরেকার যে-টুকু, তাও যে কৃত্রিম নয়, তোমার অভিজ্ঞ আঙুলগুলো কবেই তো তা জেনে গেছে।"

একেবারে আলগা হয়ে গেছে রীতা, মুখের বুলিকে ওর বেশ-বাসের চেয়েও পূর্ণ স্বরাজ দিয়েছে। শ্যাম্পু-চুলে স্কার্ফ বাঁধা, সেই স্কার্ফে আইফেল টাওয়ার, পিসার গম্বুজ, ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ, লিবারটি স্ট্যাচু ইত্যাদি গোটা দুনিয়ার হরেকরকমবা ছাপ। স্কার্ফ হাওয়ায় উড়ছে।

হঠাৎ গাড়ির তিনটে পা-দানির একটায় চাপ দিয়ে স্পীডমাপা কাঁটাটাকে সে পঞ্চাশ মাইলের দাগ বার করে দিল; চোখ-মুখ উত্তেজনায় লাল, রাস্তার পাথরের টুকরো ছিটকে ঠুক ঠুক করে ঠেকছে উইন্ডস্ক্রীনে, তবু আশ্চর্য সাহস, রীতা কপালের চুল পিছনে ঠেলে দিতে এক হাত ছেড়ে দিল, উচ্ছৃঙ্খল গলায় হেসে উঠে বলল, "আমি কত কৃত্রিম, দেখলে? কৃত্রিম ঝড় তুলতেও জানি। দাও, এবার একটা সিগারেট দাও। ওই ব্যাগটায় আছে।"

ব্যাগটা আমার কোলে। প্যাকেটটা পেলাম না, ঝুঁকে পড়ে দেখছি, কড়ে আঙুলের পোষা চোখা নখে খোঁচা দিয়ে সে বলল, "দুষ্টু ছেলে, ট্রাইং টু প্রাই ইনটু মাই প্রাইভেট অ্যাফেয়ার্স?"

শুকনো হেসে বললাম, "কী আর আছে বেবি! পাউডার লিপ্‌সটিক। বড় জোর অন্য কোন প্রেমিকের চিঠি। আর?"

বাঁ চোখ টিপে রীতা বলল, "আস্‌ক নো কোয়েশচেনস অ্যান্‌ড্‌ হীয়ার নো লাইজ্‌। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপও তো বেরুতে পারে। আমরা মেয়েরা জানো তো সাবধানী? প্রিকশনারি সরঞ্জামটাম যদি হাতের কাছাকাছি রাখি?"

সিগারেট খুঁজে পেয়েছিলাম। ধরিয়ে দিতে তবু দেরি হল, কারণ স্নায়ুভয়ে আক্রান্ত আমার হাতে, হাওয়ার ফুৎকারে, দেশলাইয়ের কাঠি পর পর নিবে যাচ্ছিল। হাত আঁজলার মত আড়াল করে ধরেও আগুনটুকু বাঁচাতে পারছিলাম না।

টিটকারি দিয়ে রীতা বলল,. "হাউ হোপলেস। গ্যাখ, তুমি বরং এই সিগারেটটাই মুখে রাখ। ধরানো সোজা হবে।"

ঠোঁট থেকে সিগারেট তুলে সে আমার মুখে গুঁজে দিল। খানিক পরে হাতের পিঠ দিয়ে ঘষতে গিয়ে দেখি, আমার ঠোঁটেও লেগে গেছে লিপস্টিকের ছোপ।

রীতা ধোঁয়া ছাড়ছিল নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে, যত প্রণালী শিখে নিয়েছিল তার প্রতিটি প্রয়োগ করে। ছাই উড়ছিল, গাড়িটা কাচে কাচে, চাকায় চাকায় থরথর করে কাঁপছিল। একটানা শাঁ-শাঁ ছাড়া তীরবেগের কোন ভাষা নেই।

রীতা সহসা সর্বাঙ্গে কঠিন হয়ে বলল, "ওগো, আমার দু' কাঁধ শক্ত করে চেপে ধর। তা হলে দেখবে আমি ঠিক চালিয়ে যাব, তোমাকে নিয়ে কোন খানায় গর্তে গিয়ে পড়ব না।"

মাঝে মাঝে আলতো আঙুলে হর্ন বাজাচ্ছিল রীতা, মৃদু মন্দ-মন্দ, যেন নূপুরের বোল, আর গাড়িটার গতি কমিয়ে তাকে আঁকাবাঁকা চালিয়ে নর্তকীর দেহের মত হিল্লোলিত করে দিল।

কাঁধ নয়, আমি একবার ওর কবজি চেপে ধরলাম।

রীতার চোখে মজার ঝিলিক দেখা গেল।—"ভয় পেয়েছ?"

"না।"

"ছাড়। অসুবিধে হচ্ছে, অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে।"

"ছাড়লেও তো বেবি, তুমি অ্যাকসিডেন্ট ঘটাবে।"

কৌশলে নিজেকে মুক্ত করে রীতা বলল, "ভয় নেই ডিয়ার, আমার চোখের দিকে চেয়ে ছ্যাখ, মরবার বাসনা আমার একদম নেই। ডাঁসা বয়েস, মন ভরা, শরীর ভরা, গেঁয়ো ভাষায় যাকে সোমত্ত যুবতী বলে—আমি তাই। নতুন গাড়ি, নতুন লাভার, আমি কোন্ দুঃখে এখন মরব বল?"

গলা শুকিয়ে এসেছিল, ফ্লাস্কে চা ছিল, সাবধানে ঢাললাম। এক চুমুক ঠোঁটে ঠেকাতেই রীতা বলল, "আমাকেও দাও। আহা-হা, আবার ঢালছ কেন, তোমারটা থেকেই দাও।"

গাড়ি দাঁড় করিয়ে এক রকম হেঁচকা টানে গ্লাসটা ছিনিয়ে নিল সে, দু' ঢোক গিলে ফের ফিরিয়ে দিল।

—"খেতে পার নির্ভয়ে। অসুখ যদি কিছু থাকে তো আমার মনে, আমার শরীরে নেই।"

"আমার শরীরে তো থাকতে পারে।"

মুচকি হেসে রীতা বলল, "ছ্যাখ, নাটক হলে একটা খুব লাগসই জবাব দেওয়া যেত। যেমন—তোমার অসুখ থাকে যদি, থাকল।

তোমার কাছ থেকে সুখই শুধু নেব, অসুখটা নেব না? কিন্তু তা-তো নয় প্রিয়তম, দরকার হয় তো, সঙ্গে ডেটল আছে, কুলকুচি করে ফেলব।”

বেলা বাড়ছে, খাঁ-খাঁ রাস্তা, ক্বচিৎ একটা ট্রাক বেসামাল তালে আমাদের পলকা গাড়িকে থেঁতলে দেবে বলে তেড়ে আসে, শেষ নিমেষে পাশ কাটায়।

রীতা, চায়ে চাঙা, তখন একেবারে ঝুঁকে পড়ে একরোখা চালাচ্ছিল।

আস্তে আস্তে বললাম, “রীতা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?”

“জাহান্নাম।” দড়াম করে ব্রেক কষল রীতা, আর-একটু হলেই গাড়ি কাত হত। “আচ্ছা, তোমার কি থ্রিল নেই, খালি ভয়, খালি হিসেব? যাওয়াটায় মজা নেই, জায়গা-জায়গা করে মরছ?”

(রীতা, তুমি জানো না, প্রায় দার্শনিকের মত কথা বলেছ। পৌঁছনো মানে তো শেষ, ফুরিয়ে গেল, আসলে আমরা স্থির নই, যেখানে আছি সেখান থেকে কেবলই চলে যেতে চাই নতুবা মনুষ্য-জাতিও স্থাবর বৃক্ষ-পর্বতাদির তুল্য সম্ভ্রান্ত জীবনপ্রাপ্ত হত।)

তখনও আমাকে চিন্তামগ্ন দেখে রীতা গালে ঠোনা মারল।—“সখা, ভেব না। তোমাকে আমি নিশ্চয় কোথাও পৌঁছে দেব,

তার চেয়েও নিশ্চয়, ফিরিয়েও দিয়ে যাব। চলে যেতে যদি তোমার এত অস্বস্তি, তবে ভেবে নাও আমরা এক জায়গাতেই আছি। দু'জন সীনশিফটার শুধু দু'পাশের দৃশ্যপট হিড়হিড় করে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।"

"গ্যাখ", দম নিয়ে রীতা বলেছে, "আমার স্বপ্নটাকে একেবারে ভেঙে দিও না। এই দিনটিকে আমি মনে মনে অনেক দিন ধরে নকশা করে রেখেছি, আজ হাতে ছেনে তাকে তৈরী করতে গেলাম। কল্পনাতে অবিশ্যি ছবিটা আলাদা ছিল। রূপকথার মত। গাড়িটা ছিল ঘোড়া, কেউ আমাকে তুলে নিয়েছে তার পিঠে, তুলেই ছুটিয়েছে জোর-কদমে, খটখট খুরে ঠিকরে পড়ছে রাস্তার খোয়া, আমি চোখ বুঁজে প্রাণপণে তার ভিজে শপশপে পিঠে বুক ঠেকিয়ে শক্ত দু' হাতে তাকে আঁকড়ে ধরেছি।"

আবিষ্ট চোখ, বাকীটুকু রীতা আর পূরণ করেনি। আমি করে নিয়েছি। এ-যাত্রায় সবই উলটো। লাগাম নেই, স্টিয়ারিং, তা-ও রীতার হাতে, আমি পার্শ্ববর্তী ঠুঁটো জগন্নাথ সঙ্গীমাত্র। হায়, সাধ্য নেই, যে-মেয়ে অপহৃতা, বলাৎকৃতা হতে চায়, তার অবচেতন বাসনা মেটাই।

হাইওয়ে ছেড়ে রীতা একটা ছায়া-ঢাকা ছোট রাস্তা নিল, সব ওর নখদর্পণে, সেই রাস্তা ক্রমশ মোরামের পথ হয়ে একটা ডাক-বাংলোর ফটকে আটকে গেছে।

"চৌকিদার!" রীতার নিপুণ-নিশ্চিত স্থির গলা।

অনিচ্ছুক একটি লোক কোমরে কষি বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে এল—তাকে করিতকর্মা, তড়িৎগতি করার জাদু রীতার দু' আঙুলে ধরে রাখা দু' টাকার নোটে ছিল।'

রীতা বলল, "কামরা খোল। ভাল চা খাওয়াতে পার যদি, আরও দু' টাকা।"

এবার ফাউ স্বরূপ সেলামও জুটল।

(সেই মুহূর্তে তোমার মনে হয়নি কি রীতা, আমরা দু'জন ভাড়াকরা দুই অভিনেত্রী-অভিনেতা—পূর্বনির্দিষ্ট কোনও মঞ্চে চুক্তিমত হাত-পা নেড়ে ঘণ্টা-দুই মাত করতে এসেছি? তুমি তো বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেই বিছানায় টানটান হয়েছ, বোঝা যাচ্ছে এই স্টেজ তোমার চেনা, তোমার পার্ট তোমার মুখস্থ ও জানা, কিন্তু আমার ভূমিকাটা কী? সাবেকী সচ্চরিত্র গল্পে নায়ক এক্ষেত্রে ন-যযৌ ন-তস্থৌ হয়ে থাকে, প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, মিটমিট করে চাখে, নতুবা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে রাখে। হালের গল্পে রিপুর রাশ টানার বালাই নেই, কুকুরে কুকুরে কাড়াকাড়ি শুরু হতে তিলেকমাত্র দেরি ঘটে না।

কিন্তু যেহেতু আমি জানি না এ নাটক আধুনিক কি পৌরাণিক, আমার অংশটা কী, আমাকে কেউ বলে দেয়নি, অতএব আমি রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রস্থানই শ্রেয় জ্ঞান করেছি। কাঠের পাটাতনে যথা-সম্ভব কম শব্দ করে ঢুকেছি বাথরুমে, ছিটকিনি তুলে তলপেটের ভার কমিয়ে বুকের ভারও হালকা করতে চেয়েছি, মুখে চোখে, গরম নিশ্বাসে ফুঁসে-ওঠা নাকে ক্রমাগত জলের ঝাপটা দিয়েছি।

তারপর বন্ধ বাথরুমের দুর্গে অনেকক্ষণ বসে বসে বাগানের গাছ

থেকে ভেসে আসা পাখিদের কণ্ঠস্বর শুনে শুনে কোন্‌টা ঘুঘু, কোন্‌টা চোখ-গেল, সনাক্ত করতে চেয়েছি।

বাইরে বেরিয়ে এসেছি যখন, তখন আমার কর্ণমূল আর চায়ের পেয়ালা দুই-ই শীতল। তুমি উঠে বসেছ, নতুন করে যখন চা ঢালছ, তখন আমি নিরাসক্ত সমঝদারের পরকলা পরে তোমাকে অ্যাকাডেমিকভাবে দেখছি। তুমি বৃন্তহীন পুষ্পসম কোন ক্লাসিক নারীতে পরিণত, তোমার পুষ্প দু'টি কিন্তু বৃন্তবন্ত এবং বিলক্ষণ বিকশিত।)

মাথা নীচু করে চা ঢালল রীতা, সঙ্গের তৈরী করা খাবারের একভাগ এগিয়ে দিয়ে বলল, "ও-ঘরে তুমি মিছিমিছি এতটা সময় লুকিয়ে কাটালে। আমি সত্যিই এখানে টায়ার্ড হয়ে একটু জিরিয়ে নিতে এসেছিলাম, তোমার ধর্ম নষ্ট করা, বিশ্বাস কর, আদৌ আমার অভিপ্রেত ছিল না। এই ছাখ, আমাদের এখন ফিরতে হবে, আমি রেডি হয়ে নিলাম বলে। তোমাকে কাঁপতে হবে না, বলব না যে একটু ঢিলে ঢিলে লাগছে, আমার 'ব্রা'-এর স্ট্র্যাপটা টাইট করে দাও।"

সত্যিই আমার সামনে দাঁড়িয়েই কাপড়টা ঘুরিয়ে পরে নিল রীতা, ব্লাউজের বোতামে পাথরের মালাটা আটকে গিয়েছিল, ব্যাকরণের সূত্র সন্ধির জট ছাড়িয়ে নিল।

আসলে আমার পৌরুষকে নস্যাৎ করার জন্যই এতটা বাড়াবাড়ি করল কিনা জানিনে।

বেরোবার মুখে রীতা চোখে কালো চশমা এঁটে নিল, বাড়তি একটা ছিল আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "রোদ এখন খুব চড়া, তুমিও পরো, নাও।"

নিলাম, যদিও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হচ্ছিল। কালো চশমা পরলেই,

আমার একটা ধারণা, আমরা কেমন আলাদা হয়ে যাই, অন্য একটা ব্যক্তিত্ব আসে যার খানিকটা রাশভারী, খানিকটা খল, কালো চশমার প্রভাবে গলার স্বরও সঙ্গে সঙ্গে যেন ভারী হয়ে যায়। পরেও এ-রকম দেখেছি। পায়ে চপ্পল যদি না থাকে, তবে নিজের বাড়িতেও কেমন বাধো বাধো লাগে, অকৃতার্থ, কৃপাপ্রার্থীর মত মনে হয়।

বিকালের মুখে কিন্তু রীতা আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল। হাওয়া ঝিরঝিরে, লম্বা লম্বা গাছগুলোর পদানত ছায়া মুছে দিয়ে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল।

সেই রীতা, অথচ এখন কেমন শালীন, স্নিগ্ধ, পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম।

বৃষ্টি নামতেই সস্নেহে বলল, "এই, তোমার দিককার কাচ তুলে দাও, ভিজে যাবে।"

অথবা "তোমার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে, সেই কোন সকালে বেরিয়েছি, এখন তো বেলা প্রায় শেষ হয়ে গেল। সসেজ আর স্যাণ্ডউইচ ক'টাই বা ছিল, ওতে কি আর পেট ভরে। একটা দু'টো হয়ত এখনও পড়ে আছে, তুমি নেবে? হাসছ যে?"

বললাম, "এমনি। এখানেও আমাদের রোল রিভারসড্, তাই দেখছি। আমি সারথি নই, তুমি। আবার কোথায় আমি, পুরুষ, খাবার খুঁজে এনে তোমাকে দেব তা-তো নয়, ভোজ্য বস্তুও যোগান দিচ্ছ তুমিই।"

বিমোহিত হয়ে আমি আরও ভাবছিলাম, এই রীতাই কি সকালে আর দুপুর বেলা টগবগ করে ফুটছিল, আর এখন দেখতে দেখতে নিস্তেজ হয়ে এল ? আমাদের প্রকৃতির তবে কঠিন কোন নির্ধারিত আকৃতি নেই, মুড, কাল, বয়স, বেলা—এমনকি বেলাও—পাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ ধরে। এই তো খানিক আগেও রীতা জ্বলজ্বল করছিল, যেন রাখা ছিল পিতলের টলমল গামলায়, আর এখন, সূয্যি যেই ডোবে-ডোবে, অমনই তাকে কে যেন সাদা চীনেমাটির ঠাণ্ডা একটা বাটিতে ঢেলে নিল, অথবা সে কি ঢেলে নিয়েছে নিজেকেই ?

রাস্তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল, ট্রাফিক এখন ছন্নছাড়া কয়েকটি লম্পট, পরস্পর মুখোমুখি হতেই যারা পরস্পরকে "কিরে শালা" চোখ মারে, অশ্লীল খিস্তি বিনিময় করে যে যার ধান্দায় সরে পড়ে।

চেনা রাস্তা, চেনা দোকান, ক্রমশ আমি আমার চেনা জগতে ফিরে আসছিলাম। পরিচিত মোড়টায় পৌঁছতেই বললাম, "রীতা, এখানে আমাকে নামিয়ে দাও।"

"কেন, তোমার বাসা পর্যন্ত যেতে বাধা আছে ? কেউ কেউ চোখ টিপবে ? কানাকানি হবে ?"

মুখে বললাম, "না।" তবু এক রকম জোর করেই নামলাম খানিক দূরেই। সেখানটাতে রাস্তার একটা আলো জ্বলছিল, কিন্তু দোকানপাট ছিল না।

ম্রিয়মাণ মূর্খ একটু হাসি দিয়েই বিদায় নিতে যাচ্ছিলাম, রীতা একটা শীতল হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "বা-রে, এত অল্পে ? আনগ্রেটফুল ব্রুট, আমার হাত ধরে একবার বলবে না, আজকের সব কিছুর জন্যে অনেক, অনেক ধন্যবাদ ?"

"ধন্যবাদ পরে, তার আগে একটা ছোট জিজ্ঞাসা ছিল। রীতা, যে বাংলোয় আমরা গিয়ে উঠলাম, ওখানে তুমি আগেও গিয়েছ, না? তোমার জানাই ছিল?"

রীতার মুখ দেখা গেল না, তবে কথাগুলি চাপা হাসির সঙ্গে মেখে মেখে সে ছুঁড়েছিল।

—"বাঃ রে, শাবাস। এই তো দিব্যি সেয়ানা চেহারাটা বেরিয়ে পড়ছে। জেলাঁস—দ্য ইটারনাল মেল। বিধাতার চিড়িয়াখানার এক আজব স্পীসিস। দেরি হয়ে যাচ্ছে, সরে দাঁড়াও। নইলে, বলা যায় না, তোমার পায়ের ওপর দিয়েই হয়ত চাকা চালিয়ে দেব।"

সেদিন যেমনই লেগে থাকুক, ওই রাস্তাটা কিন্তু সেই থেকে আমার চেতনায় গাঁথা হয়ে গেল। বারবার আমি ফিরে গেছি, প্রায়শই একা, আমার তো গাড়ি নেই, বাসের পর বাস বদলে বদলে যতদূর যেতে পারি। আর-একবার চানস দাও রীতা, সেদিন কী-কী যেন পারিনি, আজ প্রত্যয় এসেছে, সব যথোচিত করব, পারব।

গোটা জীবনই একটা লম্বা সড়ক, এই চিরকেলে উপমাও এখন বর্ণে বর্ণে সত্য বলে ঠেকে।

খালি যাওয়া না, থেকে থেকে থামা-ও। আমি যে চোখ বুঁজলে একের পর এক চেকপোসটও দেখি। আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে বিশেষ বিশেষ মাইলফলক। পাশে ছোট একটি গুমটি।

এগোবে তো টোল চারজ দিয়ে যাও। ক্যারিয়ার খোল, কী বয়ে নিয়ে যাচ্ছ দেখাও।

দেখাতে কিংবা ন্যায্য মাশুল দিতে তো আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার এই কল্পিত চেকপোসটে যারা পাহারাদার, তারা রাহাজানিও করে কেন।

এক-একটা ঘাটিতে ওরা এসে আমাকে আঘ্রাণ করছে, নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় কী বলাবলি করে হাত বাড়িয়ে বলছে "দাও।" ওরাই চায়, নাকি আমরাই সঁপে দিয়ে ছাড়পত্র পেতে চাই ?

খুব অস্পষ্ট একটা চিত্র। কবে যেন একটা ঘাটিতে দাঁড়াতেই মুখোস-পরা কয়েকজন ঘিরে দাঁড়াল, তাদের শরীরে শক্ত কোন ধাতুর আঙরাখা, মুখোসের ফোকরে চোখ অপলক।

"কই দিলে না ?"

তাদের কণ্ঠস্বর ঝাউ গাছের পাতায় হাওয়ার মত অতি ধীর কিন্তু দুর্মর।

"কী দেব ?" ভীত আমি, তখন শিশুমাত্র, জিজ্ঞাসা করেছি।

"তোমার ইনোসেনস—পরিশুদ্ধতা", আমার না-জানা দুটি শব্দ ওরা কূট মন্ত্রের মত ব্যবহার করল।

জানি না তা কোথায় আছে, আমার ছিল কিনা। ওরাই শরীর তল্লাসী করে খুঁজে পেতে কেড়ে নিল। একজন খুলে নিল আমার সাদা শার্ট, বদলে নীলে লোহায় মেশানো রঙের একটা কামিজ ছুঁড়ে দিল। বলল, "সাদা জামাটা আমাদের কাছে জমা রইল।" বলেই দে ছুট, উর্ধ্ব অধঃ, কোন্ দিকে ওরা অন্তর্ধান করল, দিশা পেলাম না।

বারবারই এই ব্যাপার ঘটেছে, গোটাকতক মাইলপোস্ট অন্তর-অন্তর।

"এখানে রেখে যাও তোমার অল্পেই উল্লাস আর বিস্ময়।"

"এখানে রাখ সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা।"

"এখানে চিৎকার করে কেঁদে ওঠার ক্ষমতা!"

এইভাবে যত এগোই তত যায়। বিনিময়ে কী পাই!

গোড়ার দিকে ওরা আমার হাতে টকটকে লাল কয়লার মত পিণ্ডাকার কী একটা পদার্থ গুঁজে দিয়েছিল। হাতের তালু জ্বলছে, ধরে রাখতে পারছি না।

—এটা কী?

—জ্ঞান! ধরে রাখতে শেখো যদি তবে কাজে লাগবে, সব জিনিস, সাদা কালো, ভালো মন্দ বুঝতে পারবে।

এইভাবেই এল সহবৎ, বিদ্যা; যা পুঁথিগত, এক পোঁচ চুনকামের মত। সেই সঙ্গে বানানো, লোক দেখানো বিনয় (বিনয়েরই ডাক নাম কি ন্যাকামো?), সহজাত বিচারের বদলে অর্জিত আচার, রাশভারী পদবী, যার নাম "সভ্যতা"।

আয়ুর রাজপথে মাইলফলক দিয়ে ভাগ-করা এক-একটা বয়স যেন এক-একটা দেশ, বেচা-কেনার মুদ্রা সব আলাদা-আলাদা।

বাট্টার হারে জিতে কিংবা ঠকে বদলে বদলে নিলাম, কিন্তু সব দেশে চলে এমন কোন মুদ্রা কি নেই, যার নাম দেওয়া যায় তুঙ্গ মনুষ্যত্ব?

পাথেয় হিসাবে আরও যা-যা মেলে তার কোন-কোনটা চিত্তবৃত্তি, যথা লোভ, মোহ, সন্দেহ ইত্যাদি। তাদের দু'চারটিকে শাস্ত্র মত রিপুও বলি।

আর থাকে যন্ত্রণা, শুকনো বারুদের মত যখন তখন জ্বলে ওঠে, ইলেকট্রিক তারের মত নিজে পুড়ে পুড়ে যায় আর পোড়ায়।

ফিরে যাবার রাস্তা খোলা থাকলে খেদ ছিল না। তা-হলে হয়ত ঘাটিতে ঘাটিতে আবার ফেরত পাওয়া যেত যা কিছু জমা দিয়ে এসেছি ঃ বিস্ময়, মমতা, বিশ্বাস, কান্না, সারল্য—ইত্যাদি। হায়, সেই নিষ্পাপ শুভ্র বস্ত্রখণ্ড আবার যদি ওরা প্রত্যর্পণ করত, তবে তা দিয়ে নিজেকে মুড়ে ফেলে সর্বাঙ্গের জ্বালা জুড়োতাম।

এখন যা পরে আছি সেই পোশাকটা যেন অ্যাসিডের দাগধরা, এখানে ওখানে ঝলসানো। জ্বলুনি বাড়ায়, লজ্জা ঢাকে না।

[চ]

"বিলাতী অরকেস্ট্রা যেন সমুদ্র গর্জন। আমরা পরস্পরের কথা ভাল করে শুনতে পাচ্ছিলাম না। হলের খাঁজে-খাঁজে, থামে আর সিলিং-এর আড়ালে অলক্ষ্য আলো নিশ্চয় আছে, আমরা চারপাশে দেখছি কৃষ্ণা চতুর্থীর ছায়া ছায়া অন্ধকার, পরস্পরের মুখ ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। তার উপর বিলাতী বাজনার বিকট অত্যাচার। সম্পূর্ণরূপে পরিরমিত স্নায়ু, দারুভূত বসে ছিলাম।"

"তুমি এই হোটেলে আগে আসনি, না?" কানের কাছে মুখ এনে বলল বলেই রীতাকে শুনতে পেলাম, উত্তরে আমি কী বললাম তার কানে গেল না।

মেনু কার্ড দেখে ফরমাস করল রীতাই।

"ড্রিংকস্, সার?"

চমকে চেয়ে দেখি নিখুঁত নিভাঁজ পোশাকে আরও একজন হুকুমবরদার, তারও হাতে ছাপানো আর-একটি কার্ড।

সেটাও রীতাই ছিনিয়ে নিল। সে কোন্ পানীয় মনোনীত করল জানি না, আমি অ-কোহল নরম, শীতল কিছু আনতে বললাম।

খানিক পরে দেখি, আমার ছোট বোতলের পাশাপাশি টেবিলে

এসে বসেছে মোটাসোটা এক বোতল বিয়ার। ওয়েটার নক্‌শা কাটা পুরু কাচের ভাঁড়ও রেখে গেছে।

ফেনা যখন উপছে পড়ছে তখন হঠাৎ সবেগে বলে উঠলাম, "রীতা, খেও না।"

চোখ ছোট করে সে বলল, "কেন।"

যুক্তি চট্‌ করে মনে পড়ল না, থতমত খেয়ে বললাম, "ওসব খাওয়া—মানে ভাল না।"

কটাক্ষ নিক্ষেপ করে রীতা বলল, "মর‍্যালিস্ট।" এমন তীব্র স্বরে শব্দটা উচ্চারণ করল যেন ওর চেয়ে খারাপ গালাগাল তার জানা ছুনিয়ায় নেই।

ধীরে সুস্থে পাত্রটা সে নিঃশেষ করল, আবার ঢালতে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে আমি একটা দৃশ্য সৃষ্টি করলাম। ছিনিয়ে নিলাম কাচের সুদৃশ্য মগটা—তুলে ধরে সবটাই ঢেলে দিলাম গলায়।

গলা ভরাট হল, বললাম "আর নেই।"

"ওদের স্টক-এ অনেক আছে। আমাকে ঠেকাতে কত খাবে। ছেলেমানুষি কোর না। ঠোঁটের কোণে কষ গড়াচ্ছে, মুছে ফেল।"

রুমাল বের করে মুছলাম।

"জানো, এই আমার প্রথম নয়।"

"কিন্তু এই শেষ।"

এত সাহস, এত প্রত্যয় কোথা থেকে এল, ভাবলেও অবাক হয়ে যাই।

"দেখা যাক।" রীতা বলল, চ্যালেনজের ঢংয়ে।

(স্বাতি, ক্ষমা কর। একটি প্রতিশ্রুতি আবার মারলাম আমি, আর-একজনকে বাঁচাব বলে। মদ ছাড়াতে মদ ধরলাম।)

ভীষণ রেগে গেছে রীতা, গরম দুধের কড়ায়ের মত বুক ওথলানো, চোখে ঝোড়ো ঝিলিক, হাতের ছুরিকাঁটা টেবিলের সাজানো প্লেট-পট না ফাটায়।

বুঝলাম, আমাকে খুব একটা অপমান করার ছুতো খুঁজছে।

একটা হালকা সুর তখন বাজছে অরকেস্ট্রায়, ফ্লোরে রমণী-পুরুষ জোড়ায় জোড়ায়।

মুচড়ে মুচড়ে শেষ করে আনা ন্যাপকিনটাকে নিয়ে যখন রীতা বুঝল আর কিছু করবার নেই, উঠে দাঁড়িয়ে ফস করে প্রস্তাব করে বলল, "এস, নাচবে?"

জানত, আমি জানি না। কাঠের পুতুলের মত আমি শুধু ঘাড় নাড়লাম।

বিছুটি-মারার মত করে রীতা বলল, "বসে থাক তবে এখানে। বলতে পার, খোঁড়াতে আর তোমাতে তবে তফাত কী?"

"কিছুমাত্র না।"

"আপত্তি আছে, অন্য কারও সঙ্গে যদি ফ্লোরে যাই?"

আবার বললাম, "কিছু মাত্র না।"

মেঘ না চাইতেই জলের মত তখনই জমিন ফুঁড়ে যেন উদয় হলেন দর্শাসই সেই পাঞ্জাবী না সিন্ধী জেনটলম্যান. সিঁথিখানা নুয়ে, প্রথামত হাত বাড়িয়ে বললেন, "মে আই—?"

বরদাত্রী মুদ্রায় হাত তুলে সঙ্গে সঙ্গে রীতা নেমে গেল ফ্লোরে। অরকেস্ট্রায় তখন দ্রুতলয়ের কোনও কাফ্রি সুর।

কানের কাছে দেয়ালির রাতের মত পটকা ফাটছে, টেবিলের আহার্য সাজিয়ে পা থাকতেও খঞ্জ আমি ছায়া-ছায়া আলোয় অনেক মূর্তির মধ্যে দেখছি বিশেষ একটি যুগল, নৃত্যপর।

ফিরে এসে একটু পাশ ফিরে রীতা আয়না খুলে জখম মুখের

পলেস্তারা মেরামত করল। সমাধা হলে, খাবার সামান্য নাড়াচাড়া করে বলল, "তোমার হয়েছে? তা-হলে চল।"

শান্ত স্বর, আর উত্তেজনা নেই।

একটা কার্ড সে পুরল ওর বটুয়ায়। অনুমান করলাম, নৃত্য-সহচর ওই ভদ্রলোকের।

"খুব বড় ফারমের উনি সিনিয়র একজিকিউটিভ, জানো? হী'জ ফ্রীকোয়েন্টলি ইন অ্যানড আউট অব দি কান্ট্রি। বিজনেসের দরকারে হামেশাই দেশের বাইরে যান।"

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তা পিছল একটি কৃষ্ণকান্ত আয়না। গাড়িতে বসেও রীতা পুরনো কথার জের টানল।—"ফ্লোরে অনেক ইনটারেসটিং গল্প বলছিলেন মিস্টার সিং। খুব তাড়াতাড়ি কাছের মানুষ হয়ে যেতে পারেন উনি।"

"কতটা, সেটা একটু আগেই চোখ দিয়ে মাপার সুযোগ হয়েছে আমার। তোমরা যখন নাচছিলে।"

কথাটা রীতাকে বিঁধল না। বলে গেল, হী টোলড মি কোয়াইট এ ফিউ স্টোরিজ, আই উড টেল য়ু ওআন। একবার য়ুরোপের এক নাইট ক্লাবে এক ইংরেজের সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়। লোকটি এক কোণে বসে স্কচ টানছিল। বাই দি ওয়ে, ড্রিংকস সম্পর্কে তোমার এত প্রেজুডিস্ কেন? মদ খেলে কী হয়।"

—"বীয়ার খেলে ভুঁড়ি বাড়ে, মোটা হয়।" (আমি এতক্ষণে একটা যুক্তি খুঁজে পেয়েছি)।

—"মোটা হয় ?" চোখ নামিয়ে রীতা নিজেরই শরীরটা যেন যাচাই করল।—"তবে খাব না। এবার খুশী ?"

কিছু বললাম না।

রীতা নিজেই বলে গেল—"যা বলছিলাম। কথায় কথায়, নেশা যখন খুব জমেছে, ইংরেজ লোকটি নিজেই বলল, ওই নাইট ক্লাবে সে রোজ আসে। কুড য়ু গেস হোয়াই ?"

"অনুমান করতে পারি। চোখের টানে। পুরুষের যা উইকনেস। ওখানে স্ট্রীপটীজটিজ আছে বোধ হয়।"

"তাই, কিন্তু পুরোপুরি নয়। স্টীপটীজের যে নায়িকা, সেই মেয়েটি ওর স্ত্রী। তাকে দেখতে আসে।"

"ও।"

"এর মধ্যে যেটা সারপ্রাইজিং সেটা ধরতে পারছ না ? প্রত্যহ একটি নারী মঞ্চে উন্মোচিত হবে, সেটা চোখ ভরে দেখতে ছোটে তার স্বামী, হোয়াট এ রোল্ !"

"স্বামী না হয়েও আন্দাজ পাচ্ছি। আজই তো সেই অভিজ্ঞতার কিছুটা পেলাম।"

"ইতরের মত কথা বোলো না। স্ট্রীপটিজ! আই ডিডন্‌ট ডু এনিথিং অব দি কাইন্‌ড ! বাট টেল মী—স্বামী যাবে কেন ? স্ত্রীকে সম্পূর্ণ দেখার সাধ ? সে সুযোগ তার তো আছেই।"

"হয়ত সকলের মধ্যে বসে, পরপুরুষ হয়ে তার স্ত্রীকে পরনারীর মত করে দেখতে চায়। অবিশ্যি আরও সাদাসিধে ব্যাখ্যাও হতে পারে। লোকটা হয়ত আমার মত বেকার, সন্ধ্যা কাটে না, স্ত্রী ঘরে থাকে না, অগত্যা তাই কী আর করে, ক্লাবেরই এক কোণে বসে মাগনা মদ চাখে, ফাউ হিসেবে ফ্রী ভিউ পায়, সময় কাটায়।"

"যাই বল, ওরা খুব লিবারেল কিন্তু। আনলাইক য়ু। ছিচকাঁদুনে জেলাসি নেই।"

"আমি তো জেলাস নই।"

হঠাৎ, যে-পা দিয়ে ক্লাচ টেপার কথা, সেই পা দিয়ে রীতা আমার পা মাড়িয়ে দিল।—"নও কেন, নও কেন, কেন নও। যে-মন জেলাস হয়, তাকে ফিক্‌সড্ ডিপজিট হিসেবে আর কোথাও গচ্ছিত রেখেছ? আমাকে দিচ্ছ শুধু সুদ? বলো, বলো, এক্ষুনি। বলতেই হবে। কাম্ ক্লীন।"

অতিশয় উত্তেজিত হয়েছিল বলেই রীতা অনতিপরে অতিশয় চুপচাপ হয়ে গেল। তা-ছাড়া কলকাতার রাস্তায় ট্রাফিকের এমনই ফাঁদ—মরব এই প্রতিজ্ঞায় যে সমারূঢ় হয়েছে একমাত্র সে ছাড়া গাড়ির চালকের আসনে বসে এ-শহরে কেউ নাটক করতে যায় না।

হয়ত খুব পরিশ্রান্ত বলেই রীতা সোজা বাড়ির দিকে গেল না। গাড়িটা ময়দানের এক নির্জন ছায়াবীথিতলে দাঁড় করালো। সিটের পিঠে ঘাড় এলিয়ে দিল, কিন্তু একটু সরে এল এদিকে, ওর গাল আমার কাঁধের প্রান্ত ছুঁয়ে রইল। (দেশাচারের ধার তুমি বিশেষ ধার না রীতা, তবু কী-করে জেনে গেছ, মড়াকে ছুঁয়ে থাকতে হয়, নইলে ভূত এসে শব দখল করে নেয়।)

"এই! তুমি ভাল আছ?" (এত মদ তুমি গেলোনি প্রেয়সি, যে এত প্রলাপ বকতে পার। এক গ্লাস তো মাত্র।)

"জবাব দিচ্ছ না কেন।" ও আমার জামার বোতাম

খুলে, বেড়াল যেন নরম জমি পেয়েছে, বুক আঁচড়াতে শুরু করেছে।

"কী বলব ভাবছি। এক, বলতে পারি, ভাল আছি। দুই, তুমি যেমন রেখেছ, তেমন আছি। দুটোর মধ্যে কোন্‌টা তোমার মনোমত ?"

"আর কথার কাটাকাটি নয়। এখন সোজা একটা কথার উত্তর দাও তো। তোমার সময় কাটে কী করে।"

"কাটে, রক্ত ঝরে ঝরে।"

"আবার। চাকরি পেয়েছ ?"

"একটা কলেজে, আপাতত লীভ ভেকানসি।"

(বানানো কথা। পৌরুষের মুখ চেয়ে বানাতেই হল। রীতা, আমাদের তাসের আড্ডায় যদি কখনও যেতে, আমার জীবিকার খানিক আন্দাজ পেতে)।

ও খুশী হল।—"জানতাম তুমি পাবে। কেউ তোমাকে আটকাতে পারবে না। দ্যাখ, তুমি বাইরে থেকে এত সাদাসিধে, আমার ঠিক বিপরীত, তবু তোমার কোন্‌টা আমাকে টানে জান ?"

"বিপরীত বলেই বোধহয় টানে।"

"ভিতরের মানুষটা। খুব খাঁটি, আমি জানি যে। আর তোমার চোখ দু'টো। কী যেন আছে। এমনিতে নিবু-নিবু, কিন্তু মাঝে মাঝে জ্বলে, জ্বলতে থাকে। আলো পাই। অনেক দূরের রাস্তা দেখি। তুমি অনেক দূরে যাবে, অনেক দূরে যেতে চাও না ?"

"কী হবে রীতা, আমি কিছুই জানি না।"

সে কাঁধ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসেছিল, নাক ঠেকিয়ে কেমন অদ্ভুত সুড়সুড়ি দিচ্ছিল আমার নাকে, কানের গোড়ায় ওর তুলতুলে আঙুল, অবশ সুখাবেশ, কাম, লোভ, মোহ ইত্যাদি কয়েকটি নাম-

লেখানো বাজে বাজারে রিপু আমাকে চ্যাংদোলা করবে বলে আস্তিন গোটাচ্ছে, আমি সাড়া দিচ্ছি, দিচ্ছি, ঘুমঘোরে, কিন্তু জেগে উঠলুম বলে, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ও কত দূরে কত কাছে, ওর শরীরের সৈকতে, বালিয়াড়িতে, কী কোথায়, আন্দাজ নিচ্ছি, অথচ তখনই প্রচণ্ড দুর্দম একটা হাসিতে এক রকম লুটিয়ে পড়লাম।

মন-টন বাজে, হাসি আসে শরীরের রিফ্লেক্স ক্রিয়া থেকে। কয়েকটি গ্রন্থি ঢিলে হয়ে যায়। কর্ণমূলে ওর নখ-সংসর্গে উপজাত হয়েছিল হাসি—এই বর্ণনা গর্ভবতী কামিনীর মত জবুথবু হয়ে পড়ল —আসলে বলার কথা এই যে, কানের গোড়ায় কাতুকুতুর মত সুখ হাসি হয়ে ফুটতে চাইছিল, আর নাকে নাক ঠেকার সুড়সুড়ি থেকে পাচ্ছিল হাঁচি।

গাড়ির কাচ আমাদের যৌথ শ্বাসের ভাপে ঝাপসা, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁচিটাকে ‘যেখানে-খুশি-সেখানে-যা’ বলে মুক্ত হতে দিলাম। সেই ঝোঁকে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল সব কয়টি রিপু, হাসির তোড়েও তারা বেবাক ফুরুত হয়ে গেল।

ঘাস ভিজে, আকাশও যেন ভিজে-ভিজে তবু তারা অপর্যাপ্ত; সদ্য-রঙকরা বাড়ির মেঝের মত—ভাল করে ধোওয়া হয়নি, সর্বত্র চুনের ফোঁটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

[ছ]

যে-ঘরটি রীতার একান্ত সেটা এই ইট-সিমেন্ট-লোহা-কংক্রীট জড়ো করে গড়া অহংকৃত-রুচি বাড়িটার প্রান্তে, যার ফটকের ফলকে লেখা আছে "প্রাইড্"। ভাঙা কাচ-বসানো দু' মানুষ সমান উঁচু পাঁচিলে বাড়িটা বন্দী।

ঝকঝকে মেঝে, নকল পাথরের টালিতে গাঁথা। নয়নারাম রঙের দেয়াল, অর্থাৎ দেয়াল যেটুকু আছে, কেবল কাচ আর কাচ। এখন, এই কাচে ডুবে গিয়েও আমি সামনের বাগানটার অনেকটাই দেখতে পাচ্ছি।

"এ-বাড়িতে তুমি এই প্রথম এলে না?"

রীতার কথাটা প্রশ্ন নয়, স্বগত, সুতরাং উত্তর দেবার কিছু নেই।

উঁকি দিয়ে সে আমার দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি মিলিয়ে নিল।—"ও, বাগানটা দেখছ?"

"হ্যাঁ, মরশুমী অনেক ফুল, চমৎকার পাতাবাহার।"

"আমার পছন্দ দিয়ে তৈরি করেছি" রীতা বলল, "বাহবা দেবে না?"—এই আবদারের সুরে।

ওকে বললাম না, আমি হলে পিছনের যে জমিটুকু খালি, সেখানে আর-একটা বাগান করতাম। নকল "পুলের" পাশে উইলো আছে থাক, কিন্তু বেলফুলের ঝাড়ও বসাতাম। জাকারাণ্ডা গাছের পাশাপাশি নিম আর নেবুও থাকত, তার সঙ্গে আমের বোল মিশে গিয়ে মিশ্র মৃদু একটি সৌরভ সৃষ্টি করত।

নেবু পাতার রস নিংড়ে ঘ্রাণ নিতাম, সমস্ত সত্তা ছেয়ে যেত। ঋতুর পর ঋতু জুড়ে চলত পাতার মহোৎসব, আমের পল্লব সবুজ থেকে হলুদ হয়ে ঝরে গিয়ে আবার আতাম্র পুনর্জন্ম নিত।

হায়, যক্ষিণী, তুমি ছোট-ছোট সুন্দর ইঁদুর দাঁতে লাল আপেলটা কাটছ, রেকাবিতে থরে থরে টসটসে আঙুরও। হুইপ্‌ড্‌ ক্রীম আর স্ট্রবেরি। তোমাকে আমি বলতে পারলাম না, লিচু, আতা, জাম আর জামরুলও আমার প্রিয় ফল।

"আমরা এই রকম একটা বাড়ি করব কেমন ?"

"এই রকম কেন ?" প্রতিবাদ করে বললাম, "নকল করব কেন ? আমরা করব আমাদের মতন।"

এই প্রতিবাদও কপট। না করলেও ক্ষতি ছিল না। কেননা, ও শুধু অলস হাতে মশগুল ছবি আঁকছে, ও নিজেও কি জানে না এ-ছবি অলীক ?

কল্পনায় আমিও একটি সাজানো ছবির মত বাড়ি দেখতে পেলাম। কেবল বুঝতে পারছি না, সেখানে আমার স্থান কোথায়, ভূমিকা কী।

আমি কি হব ওর লিলিপুলের উপরে ঝুঁকেপড়া উইলো ? কিন্তু আমি উইলো কেন হব। বিশিষ্ট কোন বাগানের সেই বিশাল বটবৃক্ষ না-ই যদি হতে পারি, ঝাউয়ের মত উদাস বাউল কেনই বা না হতে পারব। অথবা য়ুক্যালিপটাস গাছটির মত সতেজ কোনদিন ঋজু মাথা খাড়া করে দাঁড়াব না ?

কোন কথা জমছিল না। আড়মোড়া ভেঙে রীতা বলল, "আমার ওপর আজ আবার বাড়ি পাহারার ভার। তুমি কিন্তু আজ ইনটারেসটিং হয়ে উঠছ না। তাসের প্যাক আনি? দু'জনে মিলে খেলা যায়, তাসের এমন কোনও খেলা আছে, আছে নাকি, বলো না!"

প্যাকটা এনে ও বসল।

ওর হাত থেকে সেটা চেয়ে নিয়ে আমি একমনে খালি শাফ্‌ল করছি। হঠাৎ মাথায় কী যেন ভর করল, বলে উঠলাম, "রীতা, অনেক দিন তুমি বলেছ তাসের কয়েকটা ট্রিক তুমি জানো। কার্ড শারপিং, হাত সাফাই। কোডারমা না কোথায় একবার চেনজে গিয়েছিলে, সেখানে নামজাদা এক জাদুকরও ছিল, সে-ই শিখিয়েছিল। খেলাটা শিখিয়ে দেবে আমায়?"

"হাত সাফাই শিখতে চাও কেন?"

"আমার দরকার। তাসের আমিও দু'চারটে ম্যাজিক জানি, কিন্তু এইটে জানি না।"

আমার গলা আমার নিজের কানেই ঘড়ঘড়ে শোনাল।

রীতা কী বুঝল, একটু হেসে ঝট করে একটা তাস বের করে বলল, "এই ছাখ ছুরি। এবার এই ছাখ, আমি এটাকে নহলা করে ফেললাম।"

একবার থেমে সে আর-একবার দেখাল।—"আমি আরও অনেক রকম জানি। স্পেড্‌সকে হার্টস কিংবা যদি বল, ডায়মনড্‌সকে ক্লাব্‌স। আর—" রীতা এইখানে চোখ টিপল, "আর কিংকে জ্যাক, কিনা সাহেবকে গোলাম বানাতে পারি।"

"জ্যাককে কিং, রীতা, জ্যাককে কিং?"

"গোলামকে সাহেব?" রীতা শীতল নিশ্চয়তার বরফকুচি ছিটিয়ে দিয়ে বলল, "তা-ও পারি।"

[জ]

তিমিরকুমার নামে তৎকালে নবীন যুবা, অধুনা প্রবীণোপম প্রাজ্ঞ পেচক, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, সেদিন তুমি জাদুবলে "কিং" হতে চেয়েছিলে কেন ? কিং, অর্থাৎ বাদশা, কেউ জাদুবলে বনে না, রাজলক্ষণ চরিত্রেই নিহিত থাকে। পরের বরে গোলাম বড়জোর একখানি জমকালো জোব্বা ধার পেতে পারে, সাজপোশাকে চরিত্রের ভিতরকার অকৃতার্থ, কৃপাযোগ্য চেহারা তো ঢাকে না।

দিনপঞ্জীর আকারে, তিমিরকুমার, এই আখ্যায়িকার বাকী অংশ পূরণ করা তোমার পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। কেননা, মনোবিকার আর আত্মধিক্কারের কয়েকটি লক্ষণ এই সময় থেকেই তোমার মধ্যে ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে।

প্রথমত, এই সময়েই তুমি একটি যৌগিক, প্রায়-অলৌকিক শক্তি অর্জন কর, নিজেকে নিজে থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাইরে দাঁড় করানো। তারপর দ্বিতীয় সত্তার চোখ দিয়ে নিজেকেই দেখা। তার চোখে কিছুমাত্র মমতা নেই, এক নজর দেখে নিয়েই উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে, পাড়ার পাগলার পিছনে কুকুর কিংবা বখাটে বাচ্চারা যেভাবে লাগে, তেমনই।

ওই যৌগিক শক্তি অতএব যন্ত্রণাও। নির্বোধ শান্তি থেকে নিরন্তর শাস্তির রাস্তায় যাত্রার সূত্রপাত।

এর পরে ধারাবাহিকতা লুপ্ত হবে, এগোতে এগোতে এমন একটা প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছবে, যা ঊষর, ধূসর, কম্‌পাসের কাঁটা বিগড়ে গিয়েছে বলে দিক-বিদিক দেখায় না, হিমলীন আকাশ, ধ্রুবতারার অস্তিত্ব ঠাহর হয় না, কলজে নামক প্রাণের সূচক যন্ত্রটি হয়ত চলে, কিন্তু সময়ের পরিমাপক, পথের নির্দেশক আর কোন যন্ত্র কই।

ক্রমাগত এগোনোর পুরস্কার কি এই মিলল, নভ-তলে কম্পমান চিহ্নহীন পটের মত প্রতারিত একটি প্রান্তর? যখন শীর্ণ আঙুল শীতে বেঁকে যায়, কব্‌জি কাঁপে, জিহ্বার সমঝদার কোষগুলি বুঁজে আসে, কণ্ঠনালীর প্রদাহে জলও জ্বালা হয়ে যায়?

অথবা তুমি হয়ত এগোওনি, ক্রমশ ডুবেছ, পাঁকে তলিয়ে গেছে জানু, পরম্পরাক্রমে কোমর, কণ্ঠ, মাথার তালু। শুধু দু'টি হাত কোন রকমে উপরে তুলে রেখেছ, "ছিলাম" এই ঘোষণার মত, "রক্ষা কর" নিমজ্জিত আত্মায় এই প্রার্থনার মত? কবরের মাথায় করুণ ক্রুশ যেমন থাকে?

"...দ্যাট্ ওয়ান ট্যালেন্ট হুইচ ইজ ডেথ টু হাইড"—মনে পড়ে? লিখতে তুমি যদি পারতে তিমির, তবে তো একেবারেই মুক্ত হতে। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে", এই শৃঙ্গরবে পাপ, অভিশাপ সব শিহরিত হয়ে ঝরে পড়ত।

শাস্তির মেয়াদ কখনও এত ছোট হয়?

তার চেয়ে, সব ঝাপসা হবার আগে হালকা হতে চাও তো রীতাকে পত্রাকারে কয়েকটি কথা লিখে রাখতে পার।

ভেবে ছ্যাখ, সেই সময়টাতে রীতার সাহচর্যে সত্যিই কি অতখানি ডগমগ হয়ে ওঠার যুক্তি ছিল? গাঢ় গলায় রীতা কখনও কখনও বলেছে বটে, "তুমি আমাকে বাঁচাও তিমির", তুমিও বলেছ, "আর, রীতা, তুমি আমাকে"—কিন্তু সে তো অপরিমাণ মদ্যপানের অব্যবহিত পরে। মাতাল-গলায় গদ্‌গদ গাঢ়তাকে কেউ খাঁটি বলে ভুল করে?

করে না। রীতাও করেনি।

তোমার মনে আছে, রীতা, একদিন পাশাপাশি বসে ছায়াছবি দেখার সময় তুমি আড়চোখে বারবার আমাকে দেখছিলে? বাইরে বেরিয়ে এলাম যখন, তখনও রোদ্দুর, তোমার মুখের পোঁচ বাঁচাতে আমরা তাড়াতাড়ি মাঝারি ধাপের একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকেছিলাম?

পরদাটানা খুপরি, তোমার চোখে তখনও কালো চশমা ছিল। তখনও অরডার দিইনি, আমার কী রকম সন্দেহ হল, ভুষো কাচের আড়ালে স্থাপিত চোখের মণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তুমি আমাকে দেখছ।

খপ করে হাত বাড়িয়ে তোমার চোখের চশমাটা খুলে নিয়ে নিজের চোখে পরলাম।

চমকে গেলে তুমি, থতমত গলায় বললে, "এটা কী হল?"

"কিছু না", যার-পর-নাই গম্ভীর গলায় বললাম, "তোমার চোখ ছ'টো তো পাব না তাই চশমা-জোড়া খুলে নিলাম। তোমার নজরে আমাকে কেমন দেখায়, তাই দেখি।"

"পাগলামি!" ছাপানো ভোজ্য-তালিকায় মুখ ঢেকে রুষ্টস্বরে বললে।

"সত্যি বল না, আমাকে কেমন দেখতে!" বিশুদ্ধ ঔৎসুক্য আর আকুলতা আমার গলায় ফুটেছিল নিশ্চয়, হিরণ-পাত্তরে অপিহিত সত্যের মুখখানি আমি দেখে নেব—"একটা কচ্ছপ চিত হয়ে পড়ে

আছে, তোমার চোখে আমার ব্যক্তিত্ব সেই রকম, না ? আর তুমি তার সাদা তলপেটে ইচ্ছেমত সুড়সুড়ি দিচ্ছ, কেমন ?”

“তিমির, তুমি ভারী বিশ্রী কথা বল।”

“আজ জেনে রাখ রীতা, সেই কচ্ছপ কিন্তু উপুড় হবে। নিজের ইচ্ছায় সাধ্যমত এগোবে। যেমন ধর, ঠিক করেছি, আজকের যাবতীয় খরচ আমার।”

“বটে !” তুমি নাকে নাকছাবির মত হাসি ফুটিয়ে বললে।

“যা খুশি ফরমাস করতে পার। রোস্‌ট, গ্রিল, স্টেক, টারটার সস্‌—যা খুশি।”

“এখানে ওসব মেলে না”, তুমি মেনু কারড মুড়ে রেখে বললে, “তা-ছাড়া, রোজই আমি বুঝি ও-সব খাই, তোমার ধারণা ? মুখ বদলাতে মাঝে মাঝে শুকতো-চচ্চড়িও ভালবাসি।”

কথাটার দু’টো মানে ছিল, আমি একটাকে তুলে নিয়ে চটকাতে চটকাতে বললাম, “যেহেতু শুকতো-চচ্চড়ি শস্তা ?”

তুমি মুচকে হেসে বললে, “এবং হিতকারী।”

তুমি শুধু একটা আইসক্রীম ফরমাস করলে।

“আর কিছু না ?” খুব কাপ্তানের ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে বললাম।

“এই ! কত টাকা আছে তোমার ?”

“ষাট-সত্তর-আশি, প্রায় একশো’র কাছাকাছি।”

“তাতেই এত !” তুমি বটুয়ার রেশমি সুতো আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললে, “ওতে বেশি কিছু হয় না। নাও এবার ওঠ।”

যে-বেজীটা কুমির হয়ে উঠছিল, সে চুপসে হঠাৎ টিকটিকি হয়ে গেল। উপরন্তু তার লেজটাও গেল কাটা। লেজকাটা টিকটিকিটা, রীতা, তোমার কোলে পড়ে ছটফট করতে থাকল।

“কিন্তু এত টাকাই বা তুমি হঠাৎ পেলে কোথা থেকে। মেসের

পাওনা চুকিয়ে দিতে হবে বলে কালই না আমার কাছ থেকে নিলে পঁচিশ টাকা ?”

অম্লান গলায় বললাম, “টুইসানির টাকা পেয়েছি।”

রীতা, ওই হঠাৎ-নবাবির রহস্য জুয়া। সেই ফরাস, ময়লা চাদর, ধুলোভরতি শতরঞ্জিতে ছাওয়া আড্ডার কথা তোমাকে বলিনি।

“তাই বল। টুইসানি পেয়েছ বুঝি। ছাত্র, না ছাত্রী ?”

“ছাত্রী।”

ঝনঝন দান, চার আনা। চার আনায় হবে না রাজা, আট আনা ছাড়। আমি ব্লাইন্ড দিয়েছি চার আনা। বেশ, তবে আট আনা, আট আনা কেন এক টাকা। সীন ? সীন। আমি কাউনটার আট আনা। ব্লাইন্ড রইলাম। সুবিধে হবে না ওস্তাদ, আমি এক চোখ চেপে মোক্ষম দু’টি তাস দেখে নিয়েছি। ইন দ্য কানট্রি অব দ্য ব্লাইন্ড, দ্য ওআন-আইড ম্যান ইজ দ্য কিং। কিং, কিং, আমি রাজা। তোমার হাতে সাহেবের জোড়া।

“ছাত্রী ? বাবা বড়লোক ?”

“আছে এক রকম। অফিসার।”

ব্লাইন্ড, ব্লাইন্ড ব্লাইন্ড আর এক দান। সীন কে, কেউ না। এবারেও বুঝেছি ঘুঘু, তুমিই ধান খাবে। তুমি ফ্লা লভ্-এ তাসে দু’টোতেই লাকি। দুনিয়া ছাড়া। আজ কালীঘাটে পাঁঠা মানত করে খেলতে এয়েচ, না ?

"ও কী পড়ে?"

"ইংরিজি, লজিক, ইতিহাস।"

এক টাকা। এক টাকা। আমি ব্লাইন্‌ড। আমি সীন, তবে দুই। আমি ব্লাইন্‌ড দুই। আমি তবে সীন চার। (আড়চোখে চাইছি আর ঘামছি আমি। হাঁসে গিলেছে, মাছ গেঁথেছে। লড়ে গেছে দু'টো হাত। আমি কাঁপছি, আমার হাত থরথর করছে।) সীন চার? আবার সীন চার। ওরটা তবে তো নির্ঘাত, কমসে-কম রানিং ফ্লাশ। আমার হাতে কী?

"লজিক? তা হলে তো কলেজে পড়ে।"

"পড়লেই বা। একদম বাচ্চা।"

"সাবধানে থেকো, বাচ্চাদেরও বিশ্বাস নেই।"

একটা একটা করে তাস তুলছি, আমার গলা শুকিয়ে গেছে। এটা কী? সাহেব। পরেরটা? সাহেব। হে ঈশ্বর, ঠিক এই সময়ে তুমি আমার সব স্নায়ু সুইচ-অফ্‌ করে দিলে কেন, শেষ তাসটা যদি গোলাম হয়? দেখতে পাব না। সাহেবের ফ্লাশের নাগাল পাব না আমি। দান উঠছে, পাঁচ টাকা। পাঁচ। ছ'টাকা—ছয়। দশ টাকা, পুরোপুরি দশ। ওই বেজন্মা বজ্জাত লোকটা কি ব্লাফ দিচ্ছে? (সেই ট্রিক, রীতা, সেই ট্রিক, একটিবার সেটা মনে পড়িয়ে দাও, কিংবা নিজেই অশরীরীরূপে আবির্ভূত হও, গোলাম যাতে সাহেব হয়। গলা কাঠ, আমি জল খাব)।

"শো।"

বিকট শব্দ করে ঘরের মধ্যে একটা পটকা ফাটাল। মরীয়া বজ্জাত লোকটা শো দিয়েছে। আমার পাঁচটা আঙুলের একটাতেও সাড়া নেই, রক্তকণিকাগুলোও চুপ মেরে গিয়ে খেলা দেখছে। তবু কোনক্রমে তিনটে তাসই চিৎ করে ফেলেছি আমি, কুলকুল ঘামছি,

ইস্কার সাহেব, হরতনের সাহেব, চি-ড়ে-ত-নে-র—আরে, ভোলা বাবা পার করেগা, এটাও সাহেব। মা আমার ব্রহ্মময়ী, আমি মায়ের পাগল ছেলে।

"বাচ্চা-টাচ্চা যাই বল, বিশ্বাস নেই, বুঝলে?"

"বাজে কথা বোলো না। আইসক্রীম খাচ্ছ, খাও, চাও তো এর পরে ক্যান্‌ডি আনিয়ে দেব। কী-সব আজে-বাজে ইঙ্গিত করছ। ভুলে যাচ্ছ কেন আমরা শিক্ষিত, আমাদের মর‍্যাল্‌স নেই, রুচি বলে একটা জিনিস নেই?"

"আছে বুঝি?"

—চোর, চোর, হেরো, লোকটার পিটঠু কে একজন আমার ঘাড়ের উপর থেকে এতক্ষণ পিট-পিট করে চাইছিল, সে আমার কবজি চেপে ধরেছে, হিস-হিস করে বলছে, চোর। তাকিয়ার তলায় একটা সাহেব সরিয়ে রেখেছিল, পেয়ারের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে, চোর, আমি দেখেছি, চোর! হাত মুচড়ে যাচ্ছে. চোখে জল এসে পড়ছে আমার, হেরো হেরো—লোকটা ভুখা নেকড়ের মত একদৃষ্টে চেয়ে আছে, ওর চোখ ফেটে এক্ষুনি কষের মত রক্ত বেরুবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি, টুঁটি চেপে ধরবে? জলের গ্লাসটা গড়িয়ে পড়ে মেঝে ভেসে যাচ্ছে, আমার আর জল তেষ্টা দেখছি মিটল না।

ওই পিছন থেকেই আরেকজন, দয়ার অবতার কে তুমি ছাড়িয়ে দিলে আমার হাত, ধমক দিয়ে ওই পক্ষকে বললে, 'ছি, খেলায় হারজিত আছেই, হেরে গিয়ে মারপিট করতে আছে? আমিও তো একজন সাক্ষী, এ-দানে কোন গোলমাল নেই। তা-ছাড়া তিমিরবাবু শিক্ষিত ভদ্রলোক না? শিক্ষিত লোকে কখনও হাত সাফাই করে?'

সামনে স্তূপে স্তূপে নোট, খুচরো পয়সা। রগে রক্ত চলাচল

ফের শুরু হয়ে গেছে, হাত বাড়িয়ে কাচিয়ে সব কোলের কাছে জড়ো করছি আমি, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, আর গঙ্গা যমুনা কাবেরী গোদাবরী সব স্রোত কি আমার আনডারওয়্যার আর গেঞ্জিতে? গ্যাস চেমবারে এতক্ষণ মাথা রেখেছিলাম, শ্যাম-মরণ শকুনের মত আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে এই ভরসায়, সেটা হঠাৎ ফ্রিজিডেয়ার হয়ে কনকনে হিম বিলোতে থাকল, জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো আমার, কেমন করিয়া জানাব আজিকে, কেমন করিয়া, বাহবা, শাবাস, সেই গান।

এতক্ষণ যুগপৎ ছিলাম দুই জগতে, কাটা দরজায় ক্যাঁচ করে শব্দ হল, বাচ্চা ছোকরা বিল নিয়ে এসেছে, তালমিছরি আর এলাচ-দানার অনুপান সহ যা সেব্য, মিছরি আর এলাচ রীতার, বিলটা আমার, পকেটে ভাঁজ-করা নোট, আমি আজ মিটিয়ে দেব। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে ঢালব বলেই না ছুটে এসেছি, রীতার চোখে চোখ রেখে, আহা মরিরে ঢলঢল কমল আর গুনগুন ভ্রমর, কেমন করিয়া জুড়াব—সেই গান।

যেহেতু আমি শিক্ষিত আমার শিকড় মাটির তলায় চালান করে দিয়েছি, খুব উর্বর মৃত্তিকা, সেখানে ন্যায়, নীতি, রুচির তামাক-ফুলকপির মত চমৎকার চাষ হয়, এখন শিকড়টা ষোলআনা স্বকীয় লেজের মত তুলে মুখে পুরে চুষতেও পারি, যখন বিবেকের সঙ্গে মোটা টাকায় বন্দোবস্তও হয়ে গেছে, লাইসেন্স পারমিট আমার পকেটে, রীতা আমার সম্মুখে করতলে সসম্মান আড়াল রচনা করে খড়কেয় দাঁত খুঁড়ছে।

খুঁড়ুক, ওটা সরল স্বাস্থ্যবিধির অনুশাসন। প্রথমত নামমাত্র শুল্কে ও আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে যে, ওর পরিপাটি দাঁতের পাটি খাঁটি। দ্বিতীয়ত সাফ-টাফ করে না রাখলে পরিতোষ সহকারে পেট পুরে

নির্গন্ধ নিষ্কাম চুমু খেতাম কী করে। (কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি।...তুমি আছ গৃহবাসে তাই আছে রুচি, নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে)।

ময়দানের মুহব্বৎ-কি-গলি, যথোচিত ঘাস, স্নিগ্ধ কিন্তু সিক্ত নয়, অসাবধান অপরাধের মত পিছনের কাপড়ে দাগ রাখে না। তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে, তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল।

"এখানে এলে যে!"

"ওখানে আরও বসলে আর কিছু ফরমাস করতে হত কিংবা হোটেলের বয় মিনিটে মিনিটে বিল পেশ করত, ধর চুমুপিছু চার আনা?"

"তাই বলে এত নিরালায়? গা ছমছম করছে।"

"যতটা ভাবছ ততটা নয়, এদিক-ওদিক ঘাপটি মেরে অনেক গাড়ি আছে। তা-ছাড়া গভীর কতকগুলো আবেগের নিকাশের জন্যেও নিরালা লাগে। জান না, একালে যা-কিছু দার্শনিক ধ্যানধারণা, প্রাতঃকৃত্য পড়াশোনা, স্বগত সংলাপ ইত্যাদি—সব টয়লেটে? টয়লেটের সব টুকিটাকি টুকে রাখলে প্রতি সকালে একটি মহৎ-সাহিত্য সৃজিত হত।"

চলতি গাড়ির হেডলাইট এক পলকে আমাকে শুভ্র জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দিল।

"এই, তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।"—বলা উচিত ছিল আমার, কিন্তু বলল রীতা, একটু দূরে সরে গিয়ে ক্যামেরাম্যানের

মত, অ্যাপারচার ইত্যাদি ঠিক করে নিয়ে শাটার টিপবে। ভিউ-ফাইনডারে কোঁচকানো চোখ রেখে বলল, "বুঝেছি, 'টাই'-টার জন্যে। এই টাই-ই তোমাকে সুন্দর করেছে।"

সার কথা বুঝেছে রীতা, আমাদের সুন্দর করে পোশাক, কথা। যেমন এই মুহূর্তে আমি যদি একটা 'সলিলকি' শুরু করে দিই, অমনই সুন্দর হয়ে যাব। দাস্ দ্য নেটিভ হিউ অব রিজলিউশন—কোথায় যেন আছে চমৎকার সাজানো স্বগত কিন্তু বহু দর্শক-শ্রুত এই কয়েকটা কথা? তুমি সুন্দর হয়ে যাবে যদি গান ধর, যে-কোন গান, যথা—মধু গন্ধে ভরা (রবীন্দ্রনাথ), এই লভিনু সঙ্গ তব (ইবিড্), এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল (ইবিড্ নয়, ডিয়েলরায়)। আমাকে সুন্দর করেছে টাই, তোমাকে কি টাইটব্রেসট? থুড়ি, ও-কথাটা আগে চলত, আজকাল বলে 'ব্রা'—স্বরবর্ণ এদিক-ওদিক করে নিলে গাধার ডাকের মত শোনায়।

রীতা এগিয়ে এসে আমার টাইয়ের ফাঁস ঢিলে করে দিল··· ঢিলে করে দিতে তোমারটা কি পারি না আমিও, খুনীর মত নৈপুণ্যে, কিন্তু খুনীরা নাকি আঙুলের ছাপ রেখে যায়, আমি রাখব কোথায়, স্তনের ফিংগার-প্রিনট কেউ কখনও তুলেছে?

"তুমি কখনও এই পোশাক পর না কিন্তু।"

"পরি না।"

"পরলে কিন্তু বেশ মানায়।"

"রীতা", সুযোগ এসেছে, ধ্রুব অনুমান করে আমি বলে ফেললাম, "রীতা, আজ আমি একটা ইনটারভিউ দিয়ে এলাম। পোশাকটা তার জের।"

"ইনটারভিউ? কিসের।"

"বড় একটা প্রাইভেট ফারমে। কলেজের কাজটায় পোষাচ্ছিল না।" (কলেজের কাজটাও ভুয়ো, রীতা জানে না)।

"পাবে, কাজটা ?"

"আশা আছে, যদি রীতা, তুমি আমাকে সাহায্য কর।"

"আমি ?"

"তুমি। ইণ্টারভিউ বোর্ডে দেখলাম রীতা, সেই বাঁধাকপি দাড়ি-পাগড়ি মিস্টার সিং আছেন। রীতা, এই মিস্টার সিংকে তুমি চেন।···সেদিন, সেদিন ওই হোটেলে যে ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে, রিমেম্বার ? ওঁর কার্ড তোমার ব্যাগে আছে। য়ুড্ হেলপ মি রিটা, ওণ্ট য়ু ?"

ইংরেজির তোড়ে আমার রসনায় রীতার 'ত' কেমন অনায়াসে স্মার্ট "ট" হয়ে গেল অনুভব করে রোমাঞ্চিত হয়ে গেলাম। মা সরস্বতি, এই মুহূর্তে আর একটু ভর কর। দেহ অনুগ্রহ দাসে, সুবরদে !

আর-একটা গাড়ির হেডলাইট কোথা থেকে এসে আলোর হোসপাইপ ঢেলে দিয়ে গেল। গায়ে কাঁটা দিল, মন্ত্রবৎ বললাম, "একটা কেরীয়র তো চাই। আর কতকাল, এভাবে···এতে তো আমাদের দু'জনেরই ইণ্টারেস্ট। ইউ 'ড পুট ইন এ ওঅর্ড রিটা, নো ?"

অন্ধকারে ওর মুখ পড়া যাচ্ছিল না। রীতা, শুনলাম, আস্তে আস্তে বলছে, "মেবী, আই শ্যাল। ও ডিয়ার, শিওর, আই উইল।"

[ঝ]

কয়েকটি ছোট ছোট ছবি।

ক্লাবের বাইরে সাইড লেনে আলো নামমাত্র, কালো অন্ধকার ঘন হতে হতে ছোট্ট কালো গাড়িটাকে ক্রমশ ঢেকে দিল। পথ নির্জন, দুই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, সেই হেতু আরও নির্জন।

মিনিটের কাঁটা সময় কাটছে, ছোট ছোট ধারালো দাঁতে। একটা হন্তদন্ত আয়া প্র্যাম ঠেলতে ঠেলতে চলে গেল, প্র্যাম-এর মধ্যে জড়পুঁটুলি যে প্রাণীটি, তারও নাম সময়।

ছায়ারাশি ভেদ করে একটি রমণীয় কায়া ক্রমশ স্পষ্ট হল, সে আরও কাছে আসতে গাড়ির ভিতরে একটি পুরুষাকার মনুষ্যের গলা উঁচু হয়ে উঠতে দেখা গেল।

"তোমার এত দেরি হল, আমাকে সেই কখন বসিয়ে রেখে গেছ। আমার কোমর ধরে গেল।"

এই লোকটিই গল্পের নায়ক তিমির। ক্ষুণ্ণস্বরে সে বলে যাচ্ছিল, "তুমি বললে জাস্ট য়ু ওয়েট, শ্যাণ্ট বী এ মোমেনট্—সেই থেকে বসে আছি। তুমি বললে পেছনের সিটে বসে থাক, নইলে কেউ দেখে ফেলবে, তা ই সই। তোমার গাড়িটা আবার টু-ডোর।"

টু-ডোর গাড়ির পিছনের সিট থেকে গাড়িটার চরিত্রই কেমন আমূল বদলে যায়, সে বলল না। সামনের সিট থেকে তাকালে এই গাড়িই উচ্চৈঃশ্রবা, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, কিন্তু পিছনের সীটটা যেন আস্ত একটা ইঁদুরের কল। একটি জীবের মত বসে থাক, ছটফট কর, আঁচড়াও নিজেকে, অথবা খেলতেও পার, কেননা পাশেই রাখা আছে পশমের বল।

বিরস গলায় রমণী বলল, "কী করব, হি ওআর্জ'ণ্ট ইন। দেন হি কেম্ অ্যালং। দেন দেয়ার ওঅ্যার আদারস্ হ্যাংগিং অ্যারাউনড্।"

"বাট য়ু ডিড পুট ইন এ ওআরর্ড রীতা, ডিডনণ্ট য়ু?"

"ওআর্ড?" রীতা খুব সংক্ষিপ্ত প্রকারে হেসে উঠল, "আই কুড পুট ইন এ লট মোর দ্যান দ্যাট, য়ু নো।"

বলতে বলতে দরজা খুলে দিল সে—"নাউ য়ু গো। আমার দেরি হবে। লেট মী লীভ ইট লকড্।"

আর-একটি ছবি। সে হেঁটে হেঁটে ফিরছে। স্কাই লাইন আলোয় আলো। মনে পড়ল, তার ছেলেবেলায় গ্রামেও চৈত্র-বৈশাখে আকাশ মাঝে মাঝে এই রকম লালে লাল হয়ে যেত। খড়ের চালের পর চাল জ্বলত। আগুন, আগুন, ঘরের জিনিস টেনে উঠানে নামাও। জল, জল! বালতি, ঘড়া, কলসি নিয়ে শুকনো পুকুরে ছুটোছুটি।

গলায় হাত দিল সে। টাই। পরলে তাকে চমৎকার দেখায়। একটা সময়ে শুধু শারটের কলার উলটে দিত। তখনকার দিনে সেটাই ছিল স্টাইলের চরম, তাতেও চমৎকার দেখাত।

ছবি—আরও একটা।

"রীতা, তুমি থরথর করে কাঁপছ। রীতা, কী হয়েছে আমাকে বল। কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি, এই ঝড়জল মাথায় নিয়ে কেউ কখনও আসে!

তা-ছাড়া এটা বাসাবাড়ি, আসবাব বলতে তো আমার ওই বিছানা, তোমাকে কোথায় বা বসতে বলি। ভাগ্যিস এই দুপুরে ওরা সব অফিসে, কী বলত, কী ভাবত দেখে ফেললে? আমি বেকার, তাই একা এই বাড়ি পাহারা দিতে আছি।

"রীতা, তোমার মাথায় জল চিকচিক করছে, চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে, শাড়ি ভিজে। গাড়ি থেকে নেমে শুধু উঠোনটুকু পার হতেই এত ভিজে গেলে? থাক, থাক, মুখ মুছো না, লিপসটিকের লাল আর সুরমার কালো একাকার হয়ে যাবে।

"চৌকাটের উপরই দাঁড়িয়ে আছ রীতা, এতক্ষণে একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করেছ—'ভাবনা নেই, হবে।' কী হবে রীতা, খুলে বল। মিসটার সিং কী বলেছেন তোমায়, কখন বলেছেন। হবে কথাটার আমি যে মানে করেছি, হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, তা-হলে তো হুররে। বেকার থেকে এক লাফে জুনিয়র একজিকিউটিভ। রীতা, একটু বোসো, তোমাকে চা করে খাওয়াই।

"এর পরে যেদিন আসবে, তখন আমি উঠে গেছি নতুন বাড়িতে, সেখানে দেখো, বিজলী কেতলিতে জল ফুটবে। ছোট্ট শোবার ঘরের জানালায় ভেনীসীয় খড়খড়ি, তাতে আবার কপিকল লাগানো, কর্ড এই টেনে এই ছেড়ে দিয়ে চিচিং ফাঁক চিচিং বাঁধ খেলব। সংযুক্ত বাথরুমের সিংকের র‍্যাকে শিশির পর শিশি, কতমত উপচার। ইলেকট্রিক রেজর-এ জল লাগে না, কিছু লাগে না, একটু পাউডার, ঘসঘস—ডিহাইড্রেটেড ক্ষৌরী। লিভিং রুমে রেডিওগ্রাম, কিছু ফুল, বুকর‍্যাক, কিউরিও, ব্রিক-আ-ব্র্যাক।

"আর কী থাকবে, জানতে চাইছ? বলো, আর কী। প্লাসটারের টেগোর, বাঁকুড়ার ঘোড়া, কিংবা ব্রোনজের গাওটামা বুড্ঢা? থাকবে, তাও থাকবে।

"তবু, কৌতুকে কৃপায় করুণায় চোখ নাচিয়ে বলছ, আর ? আমি যখন আর ভাবতে পারলাম না, তখন, ক্লোকের তলা থেকে বদখত একটা পাথরের ডেলা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, আর থাকবে এইটে। ম্যানটলপিসে যত্ন করে বসিয়ে রোজ উপাসনা কোরো, দেবীর নাম দিও 'কেরীয়ার'।

"আর তখনও মূর্খ আমি, না-বুঝে বলে উঠেছি, তুমি আসবে না ? 'আমি ?' বলে, রীতা, তুমি হেসে উঠেছ। 'কেরীয়রের উপাসক আমিও তিমির। সেই একজিকিউটিভের ঘরেই যদি আসব, তবে সিনিয়র থাকতে জুনিয়রের ঘরে আসতে যাব কেন। মিস্টার সিং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হয়ে শীগগিরই চলে যাচ্ছেন ওয়ার্কস-সাইটে, সুরিয়াপুরায়।'

"কী শীত, কী শীত, বৃষ্টি থামল যদি, এই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া কোথা থেকে এল। ছুঁচ ফুটছে, তোমার হাড়মাস ভেদ-করা দৃষ্টির সামনে আমি তিষ্ঠোতে পারছি না, মনে হচ্ছে গায়ে কিছু নেই, আমি নগ্ন। রীতা, তোমার ঘৃণা তোমার করুণা আমাকে বিবস্ত্র করছে। এ-ঘরে যত কাঁথাচাদর সব দিয়ে আমাকে চাপা দাও, হি-হি করে কাঁপছি, দেখছ না ? তোমার ম্যাক, ক্লোক, স্কার্ফ যা আছে সব দিয়ে আমাকে চেপে ধর।

"এই মুহূর্তে এই কক্ষে কি মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হল ? তোমাকে বলতে শুনলাম, 'যা আছে, সব খুলে নিতে পার তিমির, শিউরে উঠব না, আমার আর কিছু যায় আসে না। নগ্ন হয়ে আছি আগে থেকেই। আশা, বিশ্বাস, মূল্য, মর্যাদা, সব তুমি কেড়ে নিয়েছ যে। আমাকে নিজের কাজে ব্যবহার করেছ। আমার নতুন করে খোয়াবার কিছু নেই।"

তিন বা অবশেষ

এর পর, "মরমী" পত্রিকার সম্পাদক দেখলেন, পাতার পর পাতা জুড়ে শুধু কাটাকুটি। পারম্পর্য বা কাহিনী নেই, মাঝে মাঝে ছ'চার ছত্র, তার অর্থভেদ দুষ্কর। ইতস্তত সাল, তারিখও আছে, অস্থির লোকটি কম সময় ধরে তো কষ্ট পায়নি। ওর মাথায় গোলমালের লক্ষণ কতদিন আগে প্রকট হয়েছিল ?

এই যে, সে নিজেই একটা জায়গায় লিখেছে "নিরবধি কাল অক্লান্ত, কেবল বছরের পর বছর বিয়োল। নতুন কিছু ঘটল কি ? কিছু না, শুধু পুনরাবৃত্তি।"

আবার ঃ

"পায়ে শিকলি, মন উড়ু-উড়ু, দিব্য আছি। খাসা খাঁচা, বাঁধা চাকরি, মাঝে মাঝে তিড়িং করে লাফ, অবশ্যই-ভবিতব্য প্রোমোশন। অস্তিত্ব মানে অতএব চিত হয়ে শুয়ে অবিরত আত্মরতি, অথবা কদাচ উবুড় হয়ে পড়ে মানুষী সম্ভাব ইত্যাদিকে রমণ।"

অতঃপর ঃ

"সার কথা এই বুঝেছি, আমি আমার জন্যেই আছি। তার চেয়েও বড় কথা, আমার ধারণায় বিশ্ব চরাচরে যা-কিছু, সব আছে আমার জন্যেই। কোনটার আলাদা দাম নেই, সব মদীয় সুখের উপকরণ। এক-একটা যন্ত্র যেন, আমার প্রয়োজন আর চাহিদার সঙ্গে ফিট করলেই হল। নারীও তবে কি তাই ? সব যদি যন্ত্র, তবে ভাব, ভাবালুতা, ভালবাসা এ-সবের ঠাঁই কোথায়! নাকি এরা সিগারেটের ধোঁয়ার মত—মুখ দিয়ে টানি, নাক দিয়ে বেরিয়ে যায় ?

"সারা জীবন অন্তত আমি তো তাই করলাম, হাত বাড়ালাম, যা পেলাম তা ছিঁড়ে নিলাম, ব্যবহার হয়ে গেলে কমোডে পাছা মোছার কাগজ যেমন, ওয়াক থুঃ।"

কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ডের কথা কোথায়, গোড়ার দিকে যার গৌরচন্দ্রিকা ছিল! "মরমী" সম্পাদক প্রতারিত বোধ করলেন, মজুরিও পোষাল না যে! তিমিরকুমার চাকলাদার নামক ব্যক্তিটি তাঁকে তো মোক্ষম ঠকাল! আশায় আশায় তবু তিনি পাতার পর পাতা উলটে গেলেন।

"বেশ আছ, বেশ থাক, আমার মত যারা গড়পড়তা মানুষ। ভুলেও কিন্তু কোনদিন সন্ধ্যায় পাহাড়ে সূর্যাস্ত দেখতে যেও না, কিংবা অমাবস্যায় সমুদ্র। অথবা মাঝরাত্রে মাঠের মাঝখানে কক্ষনো দাঁড়িও না, ভোরে শব-সংকীর্তন শুনতে পেলে কানে আঙুল দিও। নতুবা বিষম প্রলয় ঘটবে, থেকে থেকে ভিতর থেকে কে ডাইনির ডাক ডাকবে—'তুমি হত্যাকারী!'

এর কিছু পরেই ছোট একটি শিরোনামা—

"একটি স্বীকারোক্তি"

"হে অরণ্য, শোন। আমি তোমার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি সেই মানুষ, যে জেনেছে, গোটা জীবনটাই খুনের শিক্ষানবিশি। আত্মপর যে-বালক অনায়াসে বাল্যসখীকে তার বাবার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের পিঠ বাঁচায়। বন্ধুদের উস্‌কে দিয়ে নিজে চুরি করে পাস করে কাপুরুষ যে-কিশোর, জুয়ায় জিতবে বলে সেই যুবকই করেছে হাতসাফাই—যেন নির্ধারিত কর্মসূচী, যেন ষষ্ঠীর দিন আঁতুড়ে-লেখা বিধিলিপি। নলিনীদলগত জলমতি তরল সেই যুবাই প্রথমাকে হৃদয় দিয়ে শুধু লালসায় আকৃষ্ট হয় দ্বিতীয়ায়, যেন গন্ধা গেঞ্জি বদল, তার বেশি কিছু না; আবার দ্বিতীয়ারও ইজ্জত নিজের চাকরির তদ্বিরে কাজে লাগায়—সব একই খুনের রকমফের, হাতে খড়ি। নমুনা বাড়ানো অনর্থক— জীবনভোর এইমত ছোটবড় গর্হিত কাজ আর লজ্জাকর আপসের পরম্পরা চলে।

"হে অরণ্য, এই স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করলাম, তোমার পাতায় পাতায় লিখে নাও, মর্মরিত কর, আমাকে মুক্তি দাও।"

সর্বশেষে :

[একটি প্রার্থনা]

"হে নদি, আমি ধীরে ধীরে নেমে এই উষালগ্নে তোমাতে নিমগ্ন হয়ে পূর্বাস্য দাঁড়িয়েছি, তুমি আমাকে নাও। অরণ্যকেও বলেছি, সে কর্ণপাত করেনি, তুমি কর। নদি, আমি ধ্রুব জেনেছিলাম যে, আমি হত্যাকারী, কিন্তু কে সে! তার মুখ দেখিনি, নাম জানতাম না। তারই কাছ থেকে ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে ফিরেছি।

"আজ সেই ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি—সে ক্রুশবিদ্ধ আমারই মানবসত্তা। ছোট ছোট পেরেক ঠুকে আমি আমাকেই মেরেছি।

"হয়ত আমরা সবাই তাই করি। যা হবার কথা তা হই না, দ্যাট ওয়ান ট্যালেন্ট হুইচ ইজ ডেথ টু হাইড—না ভেবে একটি প্রতিশ্রুতিকে, একটি সম্ভাবনাকে তিলে তিলে মারি, শেষে না জেনে তারই লাশ বহন করে মরি।

"আমাদের ট্র্যাজেডি কি এই যে, কী-ভাবে বাঁচা উচিত, শিখতে শিখতেই একটা জীবন যায়, শেখা বিদ্যা কাজে লাগাব যে, হায়, এমন আর-একটা নির্ভুল জীবনে বাঁচা আর হয় না।

"ক্রুশ কাঁধে নিয়ে তাই এক-গলা জলে দাঁড়িয়েছি। নদি, আমার দু'টি প্রার্থনা : হয় তুমি শব আর ঘাতক দু'জনকেই তোমার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাও, নয় এক গণ্ডুষ জল দাও, যাতে পুনর্জন্ম পেতে পারি।"

এর পর পাতার পর পাতা শূন্য, সম্পাদক দেখলেন, আর কিছু লেখা নেই।